ঢাকা থেকে বাগেরহাট

– মণিকা

জীবন–মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ কি বা কাকে বলে তা বোঝার বয়স হয়নি তখন। মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে কি ধরনের অনুভূতি মানুষের হতে পারে সেসবও বোঝা হয়নি। তবে সেদিন সত্যি সত্যিই মুখোমুখি হয়েছিল জীবন ও মৃত্যুর মাঝামাঝি আমার গোটা পরিবার।

বাবা অধ্যাপনা করেন তখন বাগেরহাটে, সরকারি প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজে। যদিও তখন কলেজ বেসরকারি। ১৯৭৪ বা ১৯৭৫ সাল হবে। তখন জুন মাস। গ্রীষ্মের ছুটি কাটিয়ে সেদিন ফেরা হচ্ছিল বাগেরহাটে। সন্ধ্যাবেলা আমরা যখন সদরঘাটে এলাম তখনো টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল, সঙ্গে দমকা বাতাস। আবহাওয়ার পূর্বাভাস কি ছিল জানি না। তবে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় সবাই নিষেধ করছিল আজ না যাওয়ার জন্য। যেহেতু সঙ্গে ছোট ছোট বাচ্চা সে জন্য আজ থেকে যাওয়া ভালো। এ রকম সবাই বোঝাচ্ছিলেন।

আমার বাবা অসম্ভব একরোখা এবং জেদি। যেটা তিনি বলবেন সেটা করেই ছাড়েন। এবং কারো কথা তিনি কোনোদিনই শোনেন না। সে জন্যই আবহাওয়া প্রতিকূল দেখেও আট বছর থেকে ছয় মাস বয়সী চার সন্তান, স্ত্রী এবং কলেজ পড়ুয়া ছোট বোনসহ তিনি বাগেরহাটের উদ্দেশ্য ঠিকই সবার কথা অমান্য করে রওনা হলেন।

গাজীপুর থেকে বাসে করে ঢাকায় সদরঘাটে পৌছার পর দেখা গেল আগে থেকে ক্যাবিন বুক করা *সাতারু* লঞ্চ কিছুক্ষণ আগে বাগেরহাটের উদ্দেশ্যে ছেড়ে গেছে। কোনো বড় দোতলা লঞ্চ বা রকেট সেদিন নেই।

ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে লঞ্চ জার্নি সুবিধাজনক এবং আরামদায়ক হতো বলে আমার বাবা সাধারণত লঞ্চ বা রকেট স্টিমারে যাতায়াত করতেন। সব সময় চেষ্টা করতেন স্টিমার না হলে তখনকার বড় দোতলা লঞ্চ যেমন সাতারু অথবা *নাবিক*–এ ক্যাবিন ভাড়া করতে। এ জন্য আগেই এসে ক্যাবিন বুক করে যেতেন। সেদিন যে এ রকম পরিস্থিতিতে পড়তে হবে ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি তিনি।

আম্মা বললেন, চলো ফিরে যাই।

আমার একরোখা বাবা রাজি হলেন না। তিনি আজই যাবেন।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর *পূবালী* নামে ছোট দেড়তলা একটা লঞ্চ পাওয়া গেল যেটা যাবে। দেড়তলা লঞ্চ বলছি এ জন্য এক তলা লঞ্চের ওপরে মাত্র দুটো ক্যাবিন ছিল।

একটা আব্বা আমাদের জন্য বুক করলেন।

পূবালী লঞ্চে যখন আমরা উঠে গুছিয়ে বসলাম তখন সন্ধ্যা সাতটার কাছাকাছি। বৃষ্টি তখনো পড়ছে। তবে বাতাস থেমে গেছে। বাড়ি থেকে সঙ্গে আনা খাবার খেয়ে আমরা সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অনেক মানুষের সম্মিলিত চিৎকারে যখন আমার ঘুম ভাঙলো তখন চোখের সামনে হাজির হলো আমার আট বছর বয়সের এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতা। ক্যাবিন–এর দরজা খোলা, বাবা আমার ছোট ভাইকে কোলে নিয়ে দাড়িয়ে আছেন, মায়ের কোলে ছয় মাসের শিবলী, পাশে হাতে ধরা আড়াই বছরের সুমন।

মা ঠিক এভাবে চিৎকার করছেন, আল্লাহ, আমার বাচ্চাদের বাচাও, ও আল্লাহ আমার বাচ্চাদের বাচাও।

আমার মাকে কখনো চিৎকার করে কথা বলতে শুনিনি। আমার অতি শান্ত মা আমাদের বকতে পর্যন্ত পারেন না। সেই মা কিভাবে চিৎকার করে পরম করুণাময়ের কাছে করুণা ভিক্ষা করছিলেন সেটা আজও পর্যন্ত ভুলতে পারিনি।

ক্যাবিন–এর দরজা খোলা থাকায় দেখতে পেলাম সব পুরুষ মানুষ লুঙ্গি পরে, মালকোচা মেরে দাড়িয়ে আছেন সম্ভবত নদীতে ঝাপ দিয়ে পড়ার জন্য বা সাতার কাটার জন্য।

পরে শুনেছিলাম আমাদের লঞ্চ তখন ছিল বিখ্যাত চাদপুর–এর মেঘনা–পদ্মা সঙ্গমে। রাত তখন দশ অথবা সাড়ে দশটা।

আমার বাবার এমন হতবাক স্থিরতা এখনো চোখ বুঝলে দেখতে পাই। তার মুখে কোনো কথা নেই, এমনকি মায়ের চিৎকারে কোনো সান্ত্বনা বা স্বস্তিদায়ক কোনো কথা, তাও তিনি বলছিলেন না।

প্রচণ্ড বাতাসে লঞ্চ তখন দুলছে ঠিক গল্পের বইয়ে পড়া মোচার খোলের মতো। একেকবার লঞ্চ এক পাশে হেলে যায় তখনই মাল কোচা মেরে দাড়িয়ে থাকা পুরুষ যাত্রীরা আল্লাহু আকবার বলে চিৎকার করে ঝাপ দেয়ার প্রস্তুতি নেন।

আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ওই চিৎকারে। আমার মায়ের চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে আরো নারী কণ্ঠের চিৎকার, কান্নাকাটি আর সমবেত গলায় আল্লাহু আকবার বলে আজান দেয়ার শব্দও শুনতে পাচ্ছিলাম। দেখতে পাচ্ছিলাম বাইরে প্রচণ্ড বাতাস ও নদীর ঢেউয়ের মাতামাতির সঙ্গে অসম্ভব অন্ধকার। লঞ্চের সার্চ লাইটের আলো চারপাশে নিষ্ফল আলো ছড়িয়ে দেখার চেষ্টা করছিল কতোদূরে লঞ্চ স্টেশনের পন্টুন, সেই সঙ্গে ভেপু বা সাইরেন বাজিয়ে চলছিল অবিরাম।

ঠিক কতোক্ষণ এমন চলছিল জানি না। বাতাসের ঝাপটায় নদীর পানি আর বৃষ্টির ছাট আমাদের ক্যাবিন–এর ভেতরে এসে পড়ছিল বার বার।

সামনে রেলিংয়ে দাড়ানো এক ভদ্রলোক আমার বাবাকে এসে বললেন, ভাই, ওই যে দূরে দেখা যায় চাদপুর।

তখন অসংখ্য মানুষের চিৎকারে সত্যিই স্পষ্ট হলো চাদপুর–এর ঝলমলে আলো আমাদের বেচে যাওয়ার নিশানা হয়ে সত্যিই দেখা দিয়েছে।

পূবালী ঠিক একই রকমভাবে দুলতে দুলতে যখন পন্টুনের গায়ে এসে ভিড়লো তখনো অসংখ্য মায়েরা আমার মায়ের মতোই চিৎকার করছিলেন। আকুতি জানিয়ে যাচ্ছিলেন পরম করুণাময়ের কাছে তাদের সন্তানদের জন্য। চাদপুরে লঞ্চ ভেড়ার অনেক পরে আমার মা স্বাভাবিক হয়েছিলেন।

আমরা কিভাবে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম জানি না। শুধু এটুকু অনুভব করি, লঞ্চ হয়তো তখন চাদপুর লঞ্চঘাটের কাছাকাছি ছিল বলেই কোনো মতে দুলতে দুলতে পৌছাতে পেরেছিল। হয়তো বা পরম করুণাময় আমার মায়ের মতো আরো অসংখ্য মায়ের প্রার্থনা এবং আকুতি শুনে দয়া করেছিল।

আমাদের লঞ্চ ওই সারা রাত চাদপুরে নোঙ্গর ফেলে ঠায় দাড়িয়েছিল। ভোরে ঝড় পুরোপুরি থেমে যাওয়ার পরে রওনা হয়ে সন্ধ্যায় হুলারহাট হয়ে রাত দশটায় বাগেরহাট পৌছায়। আমার মনে আছে সারা দিন আমার মা শুধু পানি খেয়ে ছিলেন। তিনি ভয়, উৎকণ্ঠা এবং আতংকে এতো বেশি কাতর হয়ে পড়েছিলেন যে, কিছু খেতে পারছিলেন না।

আমরা শিশুরা খুব তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিলাম।

আজ যখন পত্রিকার পাতায় লঞ্চডুবির ঘটনা পড়ি বা টিভিতে দেখি, সঙ্গে সঙ্গে ওই দিনের স্মৃতি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। মনে হয়, আমারও একই পরিণতি হতে পারতো। পরিণত বয়সে এসে বুঝতে পারি কি ধরনের বিপদে পড়েছিলাম সেদিন। শুধু প্রশ্ন করি নিজেকেই, এর কি প্রতিকার নেই? প্রতি বছর এভাবে লঞ্চ ডুবি হয়ে অসংখ্য মানুষের অসহায় মৃত্যু এবং স্বজনহারা মানুষের এই যে আহাজারি, এর কি কোনো প্রতিধ্বনি আমরা নিজেরা করতে পারি না? এই আধুনিক যাতায়াত ব্যবস্থার যুগে এসেও কিছুই করার নেই?

উত্তরা, ঢাকা থেকে

জাল

– তাসলিমা জামান

১৯৮৯ সাল। সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে। স্বামীর হাত ধরে চলে এলাম কাপ্তাই। নির্জন পাহাড়ি এলাকা। যেদিকে তাকাই পাহাড় আর একে–বেকে চলে গেছে কাপ্তাই লেক। স্বামীর কর্মস্থল কাপ্তাই হওয়ার আমাদের বেশ কিছু দিন এখানে থাকতে হয়েছে। অফিস শেষে প্রায় বিকেলে চলে যেতাম নির্জন পাহাড়ের পাশে, কখনো বা স্পিডবোটে বহু দূরে। সে এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ।

১৯৯০ সাল ৬ জুলাই। আমাদের প্রথম বিয়েবার্ষিকী। আমরা আগে থেকেই প্ল্যান করে রেখেছিলাম সারা দিন ঘুরবো আর খুব মজা করবো। সকাল থেকেই বিভিন্ন জায়গা ঘুরে হিলটপ ক্লাব–এ দুপুরের খাবার খেয়ে চলে এলাম সোজা ঘাটে। স্পিডবোট আগে থেকে ঠিক করা ছিল। তাই দেরি না করে উঠে পড়লাম। শিশির বোটচালককে নামিয়ে দিল। ইয়ং আর্মি অফিসার সব কাজেই যার উৎসাহ। আমার দিকে তাকিয়ে রহস্যে ঘেরা একটা হাসি দিয়ে বললো, *কাবাব মে হাড্ডি দরকার আছে কি?*

শুরু হলো আমাদের যাত্রা। উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরলাম বেশ কিছুক্ষণ। একে–বেকে চলে গেছে এই কর্ণফুলি নদী। মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি। কোথাও পাহাড়ের চূড়া আবার ঢালুতে উপজাতীয়দের ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। হঠাৎ করে আমাদের বোট থেমে গেল। শিশির বললো, ইঞ্জিনের সঙ্গে কিছু একটা বেধে গেছে। এতোক্ষণে টের পেলাম আকাশ মেঘে ঢেকে গেছে। চারদিকে অন্ধকার হয়ে গেছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দূর থেকে কিছু মানুষের চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

আমাকে সে বললো, তাড়াতাড়ি লাইফ জ্যাকেট পরে নাও। মনে হয় শান্তিবাহিনী আমাদের চারপাশে চলে এসেছে।

ভয়ে চিৎকার করে কান্না শুরু করে দিলাম।

শিশির আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, কেদে লাভ নেই। কারণ তারা যে কোনো সময় আমাদের গুলি করে মেরে ফেলবে।

এদিকে ঝুমঝুম বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। আবছা আলোই দেখতে পেলাম, একজন লোক সাতরে এদিকেই আসছে। ভাবলাম শান্তিবাহিনীই হবে। আমাদের হয়তো ধরে নিয়ে যেতে আসছে।

শিশির বললো, তাদের হাতে জিম্মি হওয়ার চেয়ে চলো পানিতে লাফ দিই, ডুবে থাকবো। তারপর সাতরে যতো দূর যাওয়া যায় এগিয়ে যাবো।

নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও কিছুটা সাহস পেলাম। কারণ দুজনেই সাতার জানি। তাই কিছুটা হলেও তো যেতে পারবো! কিন্তু পানির দিকে তাকিয়ে কয়েকদিন আগে ধরা ৩৫ কেজি ওজনের কাতলা মাছের কথা মনে পড়ে গেল। হাত–পা অবশ হয়ে আসছে। এতোক্ষণে লোকটা কাছে চলে এসেছে।

আমরা পানিতে লাফ দেয়ার জন্য রেডি হচ্ছি।

হঠাৎ করে শিশির বললো, দেখো, লোকটা কিছু বলতে চাচ্ছে। হাতে ইশারা দিচ্ছে আমাদের দাড়ানোর জন্য। একা একটা লোক আসছে, হাতে কোনো কিছু নেই। আমাদের কিছুই করতে পারবে না। দেখিই না লোকটা কি বলে?

দোয়া ইউনুস পড়তে পড়তে গলা শুকিয়ে গেছে।

লোকটা কাছে এসে যা বললো তাতে আমরা দুজনেই বসে পড়লাম। কারণ তারা মাছ ধরার জন্য যে জাল বিছিয়েছে তাতেই আমাদের বোটের ইঞ্জিন বেধে গেছে। লোকটা এসেছে ছাড়িয়ে দিতে। তারা নাকি অনেক চিৎকার করেছে বোট এপাশে না আনার জন্য। কিন্তু কে শোনে কার কথা। কারণ আমরা ছিলাম মহা ব্যস্ত। বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো।

স্পিড বেশি থাকলে বোট উল্টে যেতো। ওই সময় শান্তিবাহিনী আর আর্মিদের মধ্যে ভীষণ গণ্ডগোল চলছিল। আজ এতো বছর পরেও মনে হলে ভয়ে বুকটা কেপে ওঠে। গত বছর আমার মেয়েদের দেখিয়ে এনেছি জায়গাটা। সত্যিই সেদিন বিপদের হাত থেকে বেচে গিয়েছিলাম। আল্লাহর কাছে হাজার শোকর।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন
পঞ্চগড় থেকে

একাত্তরে

– সৈয়দা খোদেজা বেগম

১৯৭১–এর মার্চ মাস। দেশজুড়ে চলছে অসহযোগ আন্দোলন, মিটিং, মিছিল, আলোচনা ইত্যাদি। যেহেতু অসহযোগ আন্দোলন, তাই আমরা কেউ–ই আমাদের কর্মস্থলে যাচ্ছিলাম না। শুধু রেডিও শুনি, পেপার পড়ি এবং আড্ডা দিয়ে সময় কাটাই। সামনে কি হবে কেউ জানি না।

আমরা তখন নারিন্দা এলাকায় থাকি। সেই সময়ে পাড়ার সকল তরুণরা মিলে রাতে পালা করে মহল্লা পাহারা দিতো। যদি বিশেষ কোনো খবর তারা পেতো, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে জানিয়ে যেতো। আমার ছোট ভাইও সেই দলের সঙ্গে ছিল।

এমনিভাবে চলতে চলতে এলো সেই ভয়ংকর ২৫ মার্চের রাত। সেদিন সন্ধ্যা থেকেই কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। রেডিওতে রাত সাড়ে আটটার ইংরেজি খবর শুনে আমরা রাতের খাওয়া সেরে ঘুমানোর আয়োজন করছি। এমন সময় হঠাৎ অনেক দূর থেকে গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেলাম। আমরা প্রচণ্ড ভয় পেলাম। কিন্তু কিছু করার ছিল না। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করবো?

এমন সময় আমার ছোট ভাই এসে বললো যে, মিলিটারিরা বাঙালিদের আক্রমণ শুরু করেছে। ট্যাংক নিয়ে রোডে নেমেছে এবং সকল ব্যারিকেড ভেঙে দিয়ে ইচ্ছা মতো গুলি চালাচ্ছে, আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে।

এভাবে রাত শেষ হলো। ফজরের কোনো আজান শুনতে পেলাম না। সকাল সাড়ে ছয়টায় বিবিসি ধরে জানতে পারলাম যে, ইয়াহিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গিয়েছে এবং নিষ্ঠুর ও বাঙালি বিদ্বেষী টিক্কা খান তখন পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনর। রেডিও পাকিস্তান থেকে কারফিউ জারির ঘোষণা দিল।

সেদিন ছিল শুক্রবার। কেউ জুমার আজান দিতে পারেনি, জামাতও পড়তে পারেনি।

২৭ তারিখ শনিবার। সরকার খুবই কঠোর ভাষায় সবাইকে *যার যার কর্মস্থলে যোগ দেয়ার* কথা বললো। অন্যথায় শাস্তি হবে।

আমার স্বামী অফিসে গেলেন।

আমি রেডিওর মিটার ঘোরাতে থাকলাম। এক পর্যায়ে জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা শুনতে পেলাম। ঘোষণাটি শুনে খুবই আনন্দ ও আশা পেয়েছিলাম।

এভাবে আমাদের আতংকিত দিন–রাতগুলো কাটছিল। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আমাদের ছিল না। বেচে থাকার জন্য শুধু কিছু খাওয়া, কথা বলা, চলাফেরা করা।

এরই মধ্যে ছোট ভাই এসে খবর ছিল যে, ৩১ মার্চ আমাদের মহল্লায় মিলিটারিরা তল্লাশি চালাবে। কি করা যায়? শিশু–বৃদ্ধ মিলে আমরা বারোজন। ঠিক করলাম আমার বাবার গ্রামের বাড়িতে চলে যাবো। ৩১ মার্চ সকালে রওনা দেবো।

স্বামী অনেক কষ্ট করে একটা জিপ যোগাড় করলেন নারিন্দা থেকে ডেমরা ঘাট যাওয়ার জন্য। কাপড়–চোপড়, গহনপত্র, বন্দুক সব নিয়ে নিলাম। শুধু রয়ে গেল আমার প্রিয় বই ও ম্যাগাজিনগুলো। খাওয়ার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। তাই খুবই সামান্য খেয়ে রওনা দিলাম।

ডেমরা ঘাটে পৌছানোর পর কোনো পরিবহনই পাচ্ছি না যা দিয়ে আমরা দীর্ঘ নদীপথ অতিক্রম করতে পারি। সেখানে আমরা ছাড়াও অনেক লোক ছিল। এমন সময় আমরা একটি লঞ্চ দেখতে পেলাম। তখন সবাই মিলে লঞ্চটা ভাড়া করলাম আমাদেরকে ঘোড়াশাল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য।

লঞ্চ ছেড়ে দিল। লঞ্চ ভর্তি লোক। আমরাও বেশ কয়েকজন। কেন যেন কোনো কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। শুধু নদীর দুই তীরের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছি। সেখানে কোনো ছন্দপতন দেখছি না। কারণ তখনো ঢাকার বাইরে মিলিটারিরা যায়নি। তখন গ্রামের মানুষগুলো ছিল খুবই আন্তরিক। একজনের বিপদে আরেকজন ঝাপিয়ে পড়তো। ঢাকা থেকে যারাই যেতো কোনো গ্রামে, সেই গ্রামের সবাই মিলে তাদের সাহায্য করতো। এমনিভাবে চলতে চলতে আমরা ঘোড়াশাল এসে পৌছালাম বিকেল প্রায় চারটায়।

ক্ষিধেয় পেটের ভেতরে এমন মোচড় দিচ্ছিল যে, আমি আর দাড়াতে পারছিলাম না। স্বামীকে বলায় তিনি হোটেল থেকে ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

জীবনে কোনো দিন এ ধরনের খাবার খাওয়ার কথা ভাবতেই পারিনি। ঝরঝরে লাল মোটা চালের ভাত, লাউ তরকারি, একটা কিসের যেন ভাজি, পানির মতো ডাল! ভাত খাওয়ার প্লেট, গ্লাস, চামচ এগুলো দেখলে খাওয়ার ইচ্ছা আপনিই চলে যায়। তবু সেদিন কি গোগ্রাসেই না সেই খাবারগুলো খেয়েছিলাম! পরে সেই খাবার খাওয়ার জন্য সবাই কতো ঠাট্টাই না করেছে আমাকে।

ইতিমধ্যে নৌকা ভাড়া করা হয়েছে আমাদের বাড়ির সবচেয়ে কাছে যে ঘাট সেখানে যাওয়ার জন্য।

আমরা সবাই নৌকায় উঠলাম। নৌকা চলতে শুরু করলো। চৈত্র মাস। নদীতে তেমন পানি নেই।

নৌকা করে প্রায় তিন মাইল পথ যাওয়ার পর সন্ধ্যা নামলো। তার মধ্যে শুরু হলো প্রচণ্ড কালবৈশাখির ঝড়। মাঝি খুব তাড়াতাড়ি নৌকাকে কিনারায় নিয়ে গেল। আমার স্বামী, আমার ছোট ভাই ও নৌকার এক মাঝি নৌকাকে শক্তভাবে ধরে রাখলো যাতে বাতাসে নৌকা উল্টে না যায়। বয়স্ক মাঝি শক্তভাবে নৌকার হাল ধরে রাখলো। এদিকে আমরা নৌকার ভেতরে বসে দোয়া-দরুদ পড়তে থাকলাম।

এক সময়ে ঝড় থামলো। নির্মেঘ আকাশে চাদ উঠলো। নৌকা আবার চলতে শুরু করলো। সেদিন রাত সাড়ে এগারোটায় আমরা আমাদের গ্রামের বাড়িতে পৌছেছিলাম।

ঢাকা থেকে

মগের মুল্লুক

- আলী জাবেদ

গত বছর আগস্টের গরমের ছুটিতে গিয়েছিলাম ইওরোপে ঘুরতে। প্রথমে ইংল্যান্ড, তারপর ফ্রান্স। যেখানেই যাই শুধু টুরিস্ট আর টুরিস্ট। ট্রেন, বাস, লঞ্চে, এমনকি হোটেল-রেস্টুরেন্টেও একই অবস্থা। বাংলাদেশে ঈদের সময়ে সর্বত্রই যে রকম একটা আনন্দ ভাব, সবার মাঝে খুশির বন্যা বয়ে যায় লন্ডন এবং প্যারিস শহরের পর্যটকদের ভিড়ে ঠিক ওই রকমই মনে হয়েছে। এসব উন্নত দেশগুলোর পর্যটন খাতের মাধ্যমে বার্ষিক যে আয় হয় তা আমাদের দেশের বার্ষিক বাজেটের একটা বিরাট অংশের সমান।

প্যারিসে গিয়ে হোটেলে ব্যাগটা রেখে গোসল সেরেই চলে গেলাম *আইফেল টাওয়ার* দেখতে। প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি লাইনে থেকে আইফেল টাওয়ারের সর্বোচ্চ স্তরে উঠলাম। সেখানে পর্যটক গ্যালারি থেকে চারদিকে ঘুরে যা দেখলাম তার বর্ণনা দেয়ার ভাষা আমার জানা নেই। পুরো প্যারিস শহরটা দেখা যায় সেখান থেকে। শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে নদী। আইফেল টাওয়ারটাও নদীর তীরেই অবস্থিত। শুধু আইফেল টাওয়ার কেন, এ নদীর দুই তীরে অবস্থিত ফ্রান্সের অন্যতম স্থাপনাগুলো। নদীপথে চলছে বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন সাইজের নৌযান।

সিদ্ধান্ত নিলাম এই নৌযানে চড়ে প্যারিস শহরের আরেকটি রূপ উপভোগ করবো। ইনফরমেশনে খোজ নিয়ে জানতে পারলাম এই নৌযানগুলোর বিভিন্ন প্যাকেজ টুর আছে। যেমন লাঞ্চ অথবা ডিনারসহ তিন চার ঘণ্টার নৌবিহার করতে পারেন। এর জন্য অবশ্য আগে থেকেই বুকিং করতে হবে। এছাড়া আছে সকাল দশটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত প্রতি আধা ঘণ্টা ও এক ঘণ্টা পর পর এক ঘণ্টার প্যাকেজ টুর। যেহেতু অল্প সময়ে অনেক স্থান দেখতে চাচ্ছি, তাই দেরি না করে আইফেল টাওয়ারের সামনে থেকে ঠিক ওই সময়ে ছেড়ে যাচ্ছে নৌযানটিতেই উঠে পড়লাম। টিকেটে নিল সাত ইউরো।

যে নৌযানটিতে উঠলাম তা বেশ সুন্দর। দোতলা। নিচের তলার চারদিকে সম্পূর্ণ কাচের দেয়াল, উপরতলা সম্পূর্ণ খোলা। অনেকটা ফেরির পাটাতনের মতো সারি সারি চেয়ার বসানো। উপর এবং নিচে মিলে কম করে হলেও পাচশ-র মতো চেয়ার সারি সারি বসানো। সবাই যার যার পছন্দ মতো স্থানে বসে দুই পাশের দৃশ্য উপভোগ করছে। পরিষ্কার স্বচ্ছ আকাশ, সুন্দর আবহাওয়া, পড়ন্ত বিকেলের সূর্যরশ্মি যখন নদীর দুই তীরের সবুজ গাছপালায় এবং নদীর পানিতে পড়ছে, সব যেন ঠিক চিক চিক করছে। কি যে এক মনোরম পরিবেশ তা বর্ণনাতীত। এতোটাই বিমোহিত হয়ে পড়েছিলাম, মনে হচ্ছিল কোনো স্বপ্ন দেখছি না তো?

প্রায় তিনশ-র উপরে পর্যটক ছিল নৌযানটিতে। সবাই সুশৃঙ্খল ও সুন্দরভাবে বসে দুই পাশের দৃশ্য উপভোগ করছিল। কোরিয়া এবং চায়নার পঞ্চাশজনেরও বেশি দুইটা গ্রুপ ছিল তাদের কম্পানির বার্ষিক টুরে। তাই নদীর দুই পাশে যতো গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় স্থাপত্যগুলো ছিল সেগুলোর বিশ্লেষণ করছিল একযোগে ফ্রেঞ্চ, জাপানিজ, চায়নিজ, কোরিয়ান এবং ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে।

এ নদীর দুই তীরে অবস্থিত প্যারিসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় স্থাপত্য। যেমন আইফেল টাওয়ার, পার্লামেন্ট ভবন, জাতীয় বিজ্ঞান ও জাদুঘর, কনকর্ড টাওয়ার, লুভ মিউজিয়াম, জাতীয় প্রচার ভবন এমন আরো অনেক দর্শনীয় স্থাপনাগুলোর বর্ণনা শুনছি এবং দেখছি। কোনটা কতো সালে নির্মিত হয়েছিল, এর নকশা কে করেছিল. কতো সালে পুনঃসংস্কার হয়েছে ইত্যাদি। কেউ ভিডিও করছেন, কেউ ছবি তুলছেন।

আমার কাধে ভিডিও ক্যামেরা, হাতে স্টিল ক্যামেরা। কখনো ভিডিও করছি আবার কখনো ছবি তুলছি।

নদীর দুই পাশ সম্পূর্ণ পাকা। মাঝে মধ্যে পানি পর্যন্ত সিড়ি নেমে গেছে। দুই তীরে সারি সারি গাছপালা। মাঝে মধ্যে সুন্দর ফুলের বাগান। একটু পর পর বেঞ্চ বসানো। সবাই বসে বিশ্রাম নেয়ার জন্য। একটু পর পর পাবলিক টয়লেট, পানির ফোয়ারা এবং খাবার পানির কি সুন্দর ব্যবস্থা করা আছে! দুই চোখে না দেখলে বর্ণনা করে বোঝানো অসম্ভব। নদীর ওপর শ শ বৃজ। বৃজগুলোর পিলার থেকে আরম্ভ করে রেলিং পর্যন্ত দুই পাশের দালানগুলোর দেয়াল এবং ছাদের কার্নিশ পর্যন্ত এতো সুন্দর কারুকার্য করা, সত্যিই দেখার মতো।

বৃজের ওপর এবং নদীর দুই পাশে হাজার হাজার পর্যটক হাটছে, বসে বসে গল্প করছে, আনন্দ-উল্লাস করছে এবং হাত নেড়ে আমাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। আমরাও হাত নেড়ে তার জবাব দিচ্ছি এবং মজা করছি। পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।

ক্ষণিকের জন্য ভীষণ ইমোশনাল হয়ে পড়ি, বাস্তবতার কথা ভুলে যাই। তখন আমার কাছে মনে হলো আমি যেন ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর ওপর দিয়ে চলছি। দুই পাশে ঢাকার যতো ঐতিহ্যবাহী স্থান এবং স্থাপত্যগুলো দেখছি। যা কিছু বলছে বা বর্ণনা দিচ্ছে সব যেন বাংলায় শুনছি। সত্যিই এক অদ্ভুত অনুভূতি যার ব্যাখ্যা দেয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

নদীর বাক ঘুরে নৌযান এমন এক স্থানে এলো যেখান থেকে পুরো আইফেল টাওয়ারসহ নিজের ছবি তোলা যায়। অর্থাৎ পেছনে আইফেল টাওয়ারটা রেখে ছবি তুললে নিজেকে আইফেল টাওয়ারের সমান উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া যায়। অপূর্ব সুন্দর ছবি আসে। সবার মাঝে হিড়িক পড়ে গেল ছবি তোলা ও ভিডিও করার। কিন্তু আমি তখনো বুড়িগঙ্গার কথাই ভাবছি।

ঠিক তখনি পাশের এক আমেরিকান নব দম্পতির *এক্সকিউজ মি* বলাতে আমার আনমনা ভাব কাটলো।

বললেন, তুমি ক্যামেরা হাতে এমন পরিবেশে ছবি তুলছো না, আনমনা হয়ে কি ভাবছো? তুমি চাইলে আমরা ছবি তুলে দিতে পারি। সেই সঙ্গে আমাদেরকেও কয়েকটা যুগল ছবি তুলে দাও।

শিওর বলে ক্যামেরা চাইলে বললেন না, আগে তোমার ছবি তুলে নিই।

ধন্যবাদ জানিয়ে আমার ক্যামেরা দিলাম তাদের কাছে। বেশ কিছু ছবি তুলে দিলেন। তারপর তাদের ক্যামেরা নিয়ে নব দম্পতির বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন পোজে বেশ কিছু ছবি তুলে দিলাম। ডিজিটাল ক্যামেরা বিধায় সঙ্গে সঙ্গেই ছবিগুলো দেখলেন এবং বেশ প্রশংসা করলেন ছবিগুলো সুন্দর হওয়ার জন্য।

আলাপের এক পর্যায়ে আমি একজন বাংলাদেশি শুনে আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং যা বললেন তার সারমর্ম হলো, এই বাংলাদেশ সম্পর্কে আমার কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। তবে বাংলাদেশিরা বেশ মিশুক, কর্মঠ, সৎ ও নিষ্ঠাবান বলেই মনে হয়েছে। তার এক সহকর্মী ছিল বাংলাদেশি আমেরিকান। ওনার আচরণ থেকেই বাংলাদেশিদের সম্পর্কে এই মূল্যায়ন।

ভালো লাগলো বাংলাদেশিদের এই মূল্যায়নের কথা শুনে।

তারপর আবার আনমনে বুড়িগঙ্গার কথাই ভাবছিলাম। এখন থেকে বিশ বছরের কর্মসূচি নিয়ে বুড়িগঙ্গার দুই পাশ পাকা করে (প্রতি অর্থ বছরে এক কিলোমিটার করে হলেও) তীরে সারি সারি গাছ লাগিয়ে পর্যাপ্ত পাবলিক টয়লেট, খাবার পানির ব্যবস্থা বাগান, ফোয়ারা বিশ্রাম নেয়ার জন্য স্থানে স্থানে বেঞ্চ বসিয়ে, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সার্বিক নিরাপত্তা বিধান বুড়িগঙ্গাতে ঘুরে বেড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত নৌযান–এর ব্যবস্থা মাধ্যমে বুড়িগঙ্গাকে আরো আকর্ষণীয় করে ঢাকাবাসী ও পর্যটকদের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করাটা কি আসলেই অসম্ভব? আমার তো মনে হয় না। যমুনা সেতু হতে পারলে এটাও সম্ভব। দরকার শুধু পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সদিচ্ছা। আমাদের নেতানেত্রীদের মাথা থেকে কমিশন পাওয়ার চিন্তা দূর হয়ে গঠনমূলক কাজের চিন্তাধারা আসুক এ প্রার্থনাই রাব্বুল আল আমিনের কাছে করছি।

এমন সময় নৌযান এসেও ঘাটে ভিড়লো। তড়িঘড়ি করে নেমে পড়লাম নৌযান থেকে। সুন্দর একটা নৌপথ ভ্রমণ হলো স্বল্প সময়ে।

টোকিও, জাপান থেকে

সি প্যারাডাইস

– জয়

গত শতাব্দীর নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও অর্থনৈতিক মন্দার কারণে জাপানে যাওয়ার প্রথম বছরেই কম্পানির ছাটাইয়ের ফলে হঠাৎ চাকরি চলে যায়। নতুনদের চাকরি জোগাড় কষ্টসাধ্য। বেকারত্বের ফলে হাতে অফুরন্ত অবসর। ঘুরে–ফিরে কৌতুহল নিবৃত্ত করতে দেশটির দর্শনীয় স্থানে যেতে থাকি। জাপানের সামুদ্রিক বন্দর ইয়াকোহামায় অবস্থিত *সি প্যারাডাইস* তখনো দেখা হয়ে ওঠেনি।

একদিন এক আত্মীয়ের কাছে প্রশংসা শুনে এক ছুটির দিনে জনৈক বন্ধুকে নিয়ে এটি দেখতে সাগর পাড়ে ছুটে যাই। আমার কাছে পাহাড়–পর্বতের স্থবিরতার চেয়ে সমদ্রের উচ্ছলতা অনেক বেশি আকর্ষণীয়। জাপানে চিত্তের খোরাক ও বিনোদনের যথেষ্ট উপকরণ চারদিকে ছড়ানো–ছিটানো। সমুদ্রের একটি অংশ ঘিরে সি প্যারাডাইস। এক আশ্চর্য নির্মাণ শৈলী। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকৃতির দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য মাছ, বিরল প্রজাতির নানান রঙ–বেরঙের জলজ প্রাণীর অপূর্ব সমারোহ উপচে পড়া দেশি–বিদেশি পর্যটকদের মুগ্ধ করেছে।

আমি বিমোহিত হলাম। এর আগে জাপানে পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ সমুদ্রের পাড় ঘেষে তৈরি টোকিও ডিজনিল্যান্ড দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম।

চারদিকে সাগর, মহাসাগর পরিবেষ্টিত অসংখ্য দ্বীপ–উপদ্বীপের সমন্বয়ে এশিয়ার সূর্যোদয়ের দেশ হিসেবে জাপান সমধিক পরিচিত। জাপানের অন্যতম চমৎকার বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ওকিনাওয়া যেখানে আমেরিকান সৈন্যদের সুদৃঢ় ঘাটি। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে দ্বীপটির যোগাযোগের প্রধান সূত্র নৌপথ এবং ব্যয়সাপেক্ষ বিমানপথ।

অতীতে বন্ধুবরেষু ইলিয়াস ছুটি কাটাতে নৌপথে ওকিনাওয়া যাওয়ার সময় এক জাপানিজ তরুণীর সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র ধরে পরবর্তীকালে প্রণয়, বিয়েবন্ধনে জড়িয়ে এখন দিব্যি জাপানে সংসার করছে।

সি প্যারাডাইস–এর সঙ্গে দেশি–বিদেশি ভ্রমণ পিপাসুদের অতিরিক্ত আনন্দের জন্য প্রমোদ তরীর ব্যবস্থা রয়েছে। যে কেউ ইচ্ছে করলে সেগুলোতে চড়ে সমুদ্রের ভেতর গিয়ে অথবা কিনারা দিয়ে ঘুরে সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে। তবে দর্শনীর বিনিময়ে সুযোগ ঘটে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ শক্ত, আমাদের দেশের সমুদ্র সৈকতের মতো অরক্ষিত নয়। সি প্যারাডাইস দেখতে গিয়ে এক জাপানিজ জেলের সঙ্গে আলাপের সূত্র ধরে কয়েকদিনের মধ্যে বন্ধুটির বদন্যতায় আমার জন্য বেশ আকর্ষণীয় বেতনে সমদ্রে মাছ ধরার একটি চাকরি জুটে যায়। ছোটবেলা বইয়ে পড়েছি সমাজে সকল পেশার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কোনো পেশাই অবজ্ঞা বা ফেলনা নয়।

কিন্তু আমাদের দেশের বাস্তবতার নিরিখে সত্য হচ্ছে, বিভিন্ন পেশার মধ্যে বিভাজন সুস্পষ্ট এবং অনেকগুলো পেশা *ঘৃণিত* বলে বিবেচিত, এমনকি সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী উপেক্ষিত ও বঞ্চিত। বক্তব্য ও মননে জাপানে সকল পেশা সমভাবে সমাদৃত বলে লক্ষ্য করেছি। সকল সংকীর্ণতা জয় করে প্রত্যেক পেশার প্রতি যথাযথ *সম্মান* দেখাতে পারে বলে জাপানিজরা উন্নতির শিখরে। পেশার প্রতি রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন একটি কর্মবিমুখ জাতির নাগরিক আমি খানিকটা ভয়–ভীতি উৎকণ্ঠার মধ্যে কাজ শুরু করি। অল্প দিনেই মাছ ধরার দুঃসাহসী পেশার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিই। অজ্ঞতা দূর হয়ে যায়।

আমাদের দেশে ইদানীং যে কোনো চাকরির কথা উঠলে সর্বক্ষেত্র যেন অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। আমার মতে, ভেতরে প্রবল আগ্রহ থাকলে সিংহভাগ ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতা অর্জন সুদূরপরাহত কিছু নয়। কেননা অভিজ্ঞতা জন্মগত কোনো অর্জন নয়। কবিতায় পড়া মেঘনা পারের ছেলের মতো শান্ত কিংবা উত্তাল সমুদ্রে আমার মাছ ধরা। মাছ, সামুদ্রিক বিভিন্ন পুষ্টিকর খাবার জাপানিজদের খুব প্রিয়। জাপানের সমুদ্রে প্রচুর মাছ।

কিন্তু এরা আমাদের অপরিণামদর্শিতার মতো পোনা, ছোট মাছ, জাটকা নিধন করে মাছের বংশ বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। এদের সুনির্দিষ্ট মৎসনীতি রয়েছে এবং জেলেসহ সকল পেশায় প্রচলিত আইন যথাযথ মেনে চলে সকল ক্ষেত্রে দেশপ্রেমের পরিচয় দেয়। কতো বিচিত্র ধরনের মাছ, জলজ প্রাণী যে ধরা পড়তো জালে তার ইয়ত্তা নেই। তবে বাংলাদেশের মাছ বাজারে জাপানিজ সামুদ্রিক একট সুস্বাদু মাছ মাঝে মধ্যে জানা যায় যা *সুরমা মাছ* নামে পরিচিত।

জাপানিজদের মাছ ধরার ইঞ্জিনচালিত আধুনিক নৌকা, জাল, অন্যান্য সরঞ্জামাদি, তথ্য যোগাযোগের সকল পদ্ধতি, প্রযুক্তি যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তৈরি। জেলে বলি, মৎস্যজীবী বলি এদের নিয়ম–কানুন, পেশাদারিত্বে অভিজ্ঞতা, কৌশলী ছাপ, প্রকৃতির রুদ্র মূর্তির সময় সময়োচিত সঠিক আবহাওয়ার তথ্যগত সতর্কতামূলক ব্যবস্থার কারণে দুর্ঘটনার পরিমাণ সহনীয় পর্যায়ে। সম্প্রতি বাংলাদেশের উপকূলে ঝড়ের কবলে পতিত মাছ ধরার বেশ কিছু ট্রলার ডুবিতে অনেকের সলিল সমাধি হয়। প্রতি বছর অনেক মৎস্যজীবীদের জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। অনেকটা মান্ধাতার আমলের প্রচলিত এ দেশের গরিব জেলেরা সীমাবদ্ধতা ও বহু প্রতিকূলতার মধ্যে মাছ ধরে। প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। কিন্তু জেলেদের চেয়ে মধ্যস্বত্ব ভোগী দালাল–ফড়িয়ারা বেশি লাভবান হয়।

উপকূলীয় অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের প্রতি সরকারর বিশেষ দৃষ্টি দেয়া উচিত। তাদের জন্য আধুনিক মৎস্য সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা সরকারের কর্তব্য। আমার মাছ ধরার চাকরিটি জাপানে প্রচণ্ড শীতের কারণে পাচ

ছয় মাস পরে ছেড়ে দিতে হয়। জাপানে বেশ কয়েকমাস তীব্র শীত পড়ে, তুষারপাত হয়। আমাদের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষের এরূপ শীতপ্রধান দেশে উন্মুক্ত স্থানে কাজ করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

প্রবাসী প্রথম পর্বে সাউথ কোরিয়া থেকে জাহাজে জাপানে পৌছানোর এক ভীতিকর নৌ ভ্রমণের কাহিনী প্রিয় যাযাদির পাঠক পাঠিকাকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু মাছ ধরার এই নৌযানে উপলব্ধি করেছি এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি। কাকতালীয়ভাবে মজার ব্যাপার হলো, সাউথ কোরিয়া থেকে যাত্রীবেশে আমাদের জাহাজের ক্যাপ্টেন অত্যন্ত সন্তর্পণে আমাদের সকলকে অবৈধভাবে ইয়াকোহামা বন্দরে অতীতে নামিয়ে দিয়েছিলেন।

পূর্ব বাড্ডা, ঢাকা থেকে

ব্যাংকক বিভ্রাট

– মাহমুদ হাসান খান

বিয়ের কয়েকদিন পরই আমি আর রুমা হানিমুনে চলে গেলাম থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক–এ।

বাংলাদেশ বিমানের বিশাল এয়ারবাসটি মিয়ানমার হয়ে সন্ধ্যায় ব্যাংকক আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টে নামলো। ইমিগ্রেশনের ঝামেলা শেষ করে হোটেল নির্বাচনের দিকে মনোযোগ দিলাম। এক্ষেত্রে ঢাকার এক লাগেজ পার্টি *হোটেল বুরাপা* নামে একটি হোটেলের নাম দিয়েছিল। সেটিতে ওঠার সিদ্ধান্ত নিলাম। তবে এটি যে একটি ভুল সিদ্ধান্ত ছিল তা হোটেলে গিয়েই টের পেলাম। কারণ হোটেলটি ছিল শস্তা টাইপের আর ঘিঞ্জি। রুমগুলো স্যাতস্যাতে, সব সময় লাইট জ্বালিয়ে রাখতে হয়, এমনই অন্ধকার। লাগেজ পার্টিরা হয়তো শস্তার জন্য এসব হোটেলেই থাকে। কিন্তু আমার তো এমন দায় পড়েনি। তাই পরদিন সকালে নতুন হোটেল খুজতে বের হলাম।

হোটেল খুজতে খুজতে ব্যাংকক শহর দেখতে লাগলাম। শহরটির বাড়িঘর, রাস্তাঘাট পুরনো হলোও বেশ পরিষ্কার। যা দেখি তা–ই ভালো লাগে। তবে পাহুরাত এলাকার ফুটপাথে হাটতে হাটতে যেন ঢাকাতেই ফিরে গেলাম। ঢাকার মতোই ফুটপাথে হকারদের পসরা, হাটা বেশ কষ্টকর। বেশ কয়েকটি বাংলা সাইনবোর্ডও চোখে পড়লো। বেশির ভাগ বাংলাদেশিদের মালিকানাধীন ট্রাভেল এজেন্সি বা রেস্টুরেন্ট। আমরা *কস্তুরী* নামের একটি রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। সেখানে তখন চলছিল প্রায় হাফ ডজন বাংলাদেশির রাজনীতি, অর্থনীতি নিয়ে তুমুল আড্ডা। এখানে বসে সকালের নাশতা সারলাম। হোটেলবয়ের কাছে আমাদের উদ্দেশ্য জানালাম। ছেলেটি অ্যাম্বাসাডর নামের একটি হোটেলের ঠিকানা দিল।

কস্তুরী থেকে ফিরে বাক্স প্যাটরা বেধে আবার রওনা দিলাম সুকুমভিট রোডে হোটেল অ্যাম্বাসাডরের উদ্দেশ্যে। হোটেল অ্যাম্বাসাডরের দুটো ভবন, মেইন উইং আর টাওয়ার উইং। আমরা টাওয়ার উইংয়ের আঠারো তলার একটি রুম নিলাম। যদিও ভাড়া কিছু বেশি মেইন উইংয়ের তুলনায়। স্থাপত্য সৌন্দর্যের কারণে।

রুমে ঢুকেই ভাড়া বেশি দেয়ার দুঃখটা ভুলে গেলাম। কারণ আমাদের রুম থেকে গোটা ব্যাংকক শহর দেখা যাচ্ছিল ঝকঝকে ছবির মতো। দূরে দেখা যাচ্ছিল সর্পিল গতিতে বয়ে যাওয়া চমৎকার একটি নদী। পোর্টারের কাছ থেকে জানলাম এটিই থাইল্যান্ডের বিখ্যাত ছাওফ্য়া নদী। নদীর দেশ বরিশালের মানুষ আমরা। স্বাভাবিকভাবেই নদী আমাদের উদ্বেলিত করে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম ছাওফ্য়া নদীতে নৌ ভ্রমণের।

পাচ ছয় দিন ব্যাংকক, পাতায়া ঘুরে–ফিরে এসে ঢাকা ফেরার আগের দিন নদী ভ্রমণের সিদ্ধান্ত হলো। হোটেল ডেস্কে জানলাম ছাওফ্য়া নদীতে ভ্রমণের সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা হলো কোনো বোট রেস্টুরেন্টের মাধ্যমে ভ্রমণ পরিকল্পনা করা। বোট রেস্টুরেন্ট হলো এক ধরনের বিশাল কাঠের রাজকীয় নৌকা যার একমাথা

পঙ্খিরাজের মতো, অন্য মাথা সাধারণ নৌকার মতো। এর খোলা পাটাতনে থাকে চেয়ার–টেবিল যেখানে ডিনার সার্ভ করা হয়।

হোটেল ডেস্ক থেকে *ডেইরি কুইন* নামে একটি বোট রেস্টুরেন্টের ফোন নাম্বার নিলাম। সেখানে ফোন করার পর তারা একটি ঠিকানা বললো যেখান থেকে বোটে উঠতে হবে। তারা আরো জানালো, আমাদের সৌভাগ্য যে আজ পূর্ণিমা। তাই ফুল মুন প্রোগ্রামে অংশ নিতে পারবো।

টুরের সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত। বিকাল পাচটার দিকে রওনা হলাম। দুর্ভোগের শুরু এখান থেকেই। একটি ট্যাকসি ডেকে তাতে ওঠে ডেইরি কুইন–এর ঠিকানা বললাম।

ড্রাইভার কি বুঝলো কে জানে, চালাতে শুরু করলো। প্রায় আধঘন্টা চালানোর পর পেছন ফিরে জানতে চাইলো এবার কোনদিকে যাবে।

আমাদের তো ত্রাহি অবস্থা। তাকে আবারও টেলিফোনে পাওয়া ডেইরি কুইন–এর ঠিকানা বললাম।

ড্রাইভার দুই তিনবার মাথা ঝাকিয়ে কি যেন বললো। তারপর আবার চলতে শুরু করলো। মিনিট পাচেক চলার পর ট্যাকসি থেমে গেল এবং আমাদের নেমে যাবার অনুরোধ করলো। সঙ্গে সঙ্গে সে অন্য একটি ট্যাকসি থামিয়ে তাতে আমাদের উঠিয়ে দিল। সেই ট্যাকসি ড্রাইভারকে থাই ভাষায় কি যেন বুঝিয়ে বললো। অবশ্য সে এতোটা পথ আমাদের আনার জন্য কোনো ভাড়া নিল না।

নতুন ট্যাকসি ড্রাইভার কোনো কথা না বলে ট্যাকসি চালাতে লাগলো। সেই যেন চলা শুরু হলো আর থামার নাম নেই। মিটারে সাই সাই করে বাড়তে লাগলো দূরত্ব আর ভাড়া। প্রায় ঘণ্টা খানেক চলার পরও থামার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। একটি বড় বৃজ পার হয়ে আমরা এরই মধ্যে শহর ছাড়িয়ে প্রায় গ্রামের দিকে চলে এসেছি। নির্জন হাইওয়েতে একশ কিলোমিটার গতিতে গাড়ি চলছিল। হাইওয়ের দুই পাশে কোনো বাড়িঘরের দেখা নেই। এমনকি গাড়ির সংখ্যাও কম। রাস্তার ফুটপাথে মানুষ তো দূরের কথা, কোনো প্রাণী পর্যন্ত নেই। এবার একটু একটু করে ভয় করতে লাগলো। কারণ হোটেল থেকে ডেইরি কুইন আধ ঘণ্টার বেশি লাগার কথা নয়। অথচ আমরা ট্যাকসিতে চলেছি প্রায় দেড় ঘণ্টা হলো।

ব্যাংককের ট্যাকসি ড্রাইভারদের নানান কুকীর্তির কথা পড়েছি পত্রিকায়, দেখেছি ইংরেজি সিনেমাতে। সে রকম কোনো পাল্লায় পড়েছি কি না কে জানে!

রুমাকে বলতেই ভয়ে সিটিয়ে গেল এবং হোটেলে ফিরে যেতে অনুরোধ করলো। ফিশ ফিশ করে জানালো, তার কাছে নাকি ড্রাইভারকে ভূত, প্রেত জাতীয় মনে হচ্ছে।

আমিও ভাবলাম যথেষ্ট হয়েছে। এবার ভালোয় ভালোয় হোটেলে ফিরে যেতে পারলেই হলো। ট্যাকসি ড্রাইভারকে বললাম, আমাদের কোথাও যাবার দরকার নেই। তুমি গাড়ি ঘুরিয়ে হোটেল অ্যাম্বাসাডরে ফিরে যাও।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। থাই ভাষায় কি যেন বলে সে চালাতেই লাগলো সামনের দিকে। রুমা হাউমাউ করে কান্না শুরু করলো।

আমি এবার বেশ ধমকের সুরে গাড়ি ঘোরাতে বললাম।

ড্রাইভার মাথা ঘুরিয়ে ভাঙা ইংরেজি আর দেহভঙ্গিতে জানালো যে, এটা হাইওয়ে। তাই এখানে গাড়ি ঘুরানো যাবে না। এ জন্য আরো অন্তত পাচ কিলোমিটার সামনে যেতে হবে।

আমিও জানালাম, সামনের সুযোগই যেন সে গাড়ি ঘুরিয়ে ফেলে।

মিনিট পাচেক পরে একটি ফ্লাইওভারে উঠে গাড়ি ঘুরিয়ে ব্যাংককের দিকে চলতে শুরু করলো।

সব আশংকাকে মিথ্যা প্রমাণ করে আরো প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পরে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। তবে ভাবে যা বুঝলাম তাতে মনে হলো ড্রাইভারের কোনো দোষ নেই। সম্ভবত ভাষাগত দূরত্বের কারণেই এ বিভ্রান্তিটা

হয়েছে। থাইল্যান্ড পর্যটকদের স্বর্গভূমি হলেও অধিকাংশ ট্যাকসি ড্রাইভার ইংরেজি জানে না। আমাদের ড্রাইভারও মনে হয় ঠিক মতো বুঝতে পারেনি আমাদের গন্তব্যের কথা। হয়তো আমাদের সে নিয়ে যাচ্ছিল অন্য কোনো শহরে। তাই এতো শখের ছাওফ্রয়া নদী ভ্রমণের সাধ অপূর্ণ রেখেই ব্যাংকক ছাড়তে হলো। মাঝে গচ্চা গেল চারশ থাই বাথ।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

জীবনের দাম

- মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম লিমটন

লঞ্চ থামাও, লঞ্চ থামাও! হঠাৎ শুনি লঞ্চের ডেকের যাত্রীরা চিৎকার করছে। কি হলো, হাতের বইটি রেখে ক্যাবিন থেকে জানালা দিয়ে নদীর দিকে উকি মারলাম। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। চারদিকে শুধু ঘোলা পানি আর অন্ধকার।

ক্যাবিন থেকে বের হয়ে ডেকে এলাম। দেখি সবাই লঞ্চের পেছন দিকের নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। একটি স্পিডবোট এই ঘোলা জ্বলে কি যেন খুজছে। আশপাশের লোকদের জিজ্ঞাসা করলাম, কি ভাই, কি খুজছেন। লঞ্চই বা কেন থামাতে বলছে সবাই। লঞ্চ তো ছাড়লো আধ ঘণ্টাও হয়নি।

কেউ আমার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগ্রহ দেখাচ্ছে না। সবাই উদগ্রীবভাবে চেয়ে আছে পানি আর স্পিডবোটটির দিকে। এদের মধ্যে একজন সদয় হয়ে বললেন, দেখছেন না, একটা লোক পানিতে পড়ে গেছে। তাকে পাওয়া যায় কি না দেখুন?

জোয়ারের পানির যে স্রোত তা তো নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি। তার উপর পানি একদম ঘোলা। এতোক্ষণে লঞ্চ থামানো হয়েছে। কেউ বলছে, লোকটা লঞ্চের ব্লেডের নিচে চলে গেছে, আবার কেউ বলছে ,হয়তো স্রোতের টানে কমসে কম আধা মাইল দূরে চলে গেছে। কেউ বলছে আবার এই ঘোলা জলে তলিয়ে গেছে।

যে ভদ্রলোকটি আমার কথার উত্তর দিলেন তাকেই আবার জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই, ওই লোকটি পানিতে কিভাবে পড়লেন?

তিনি উত্তরে বললেন, আরে ভাই, আমাদের তো সময় জ্ঞান নেই, যে লোকটি পানিতে পড়ে গেছে সেই লোকটি লঞ্চ ফেল করেছে। লঞ্চ ফেল করে লঞ্চ ধরার জন্য স্পিডবোট ভাড়া করে এই পর্যন্ত এসেছে। তারপর চলন্ত অবস্থায় স্পিডবোট থেকে এ লাফ দিয়েছে লঞ্চের ওঠার জন্য। কিন্তু ব্যালান্স রাখতে পারেনি। স্পিডবোট আর লঞ্চের মাঝখান দিয়ে নদীতে পড়ে গেছে। তারপর স্রোতের টানে কোথায় চলে গেল যে দেখাই গেল না।

এ কথা শুনে হতবাক হয়ে গেলাম এবং খুব টেনশনে পড়ে গেলাম।

ভদ্রলোকটির ভাগ্য খুব ভালো, স্পিডবোটটি তাকে অনেক দূর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এলো। সবাই দৌড়ে গেল স্পিডবোটটির ধারে, ভদ্রলোকটিকে লঞ্চে ওঠাতে সাহায্য করলো। কেউ উপদেশ দিল আবার কেউ বকাবাজি করলো। মুহূর্তে চারপাশে লোক জড়ো হয়ে গেল। সবাই তাকে দেখছে।

আমিও তাকে দেখার জন্য এগিয়ে গেলাম। কিন্তু ভিড়ের চাপে তাকে দেখার সৌভাগ্য হলো না। একে একে সব লোক সরে যাওয়ার পর গেলাম তার কাছে। দেখি ভদ্রলোকটি শীতে কাপছেন। বয়স আটাশ থেকে ত্রিশের মধ্যে হবে।

এখানে বলে রাখা ভালো যে, সেই সময়টা ছিল শীতকাল। তাকে আমার হাতের টাওয়েলটি বাড়িয়ে দিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কি করেন?

গা মুছতে মুছতে বললেন, একটি প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করি, ছুটি নিইনি। তাই কালকে সকালেই কাজে যোগ দিতে হবে। না করতে পারলে সমস্যা হবে।

তখন বললাম, আপনি যদি আজকে আর না বেচে থাকতেন তাহলে এই চাকরি দিয়ে কি হতো!

তখন ভদ্রলোকটি বললেন, ভাই, জীবনে আর এ রকম লাইফ রিস্ক নেবো না। এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছি যে, সময়ের চেয়ে জীবনের দাম অনেক বেশি।

গেন্ডারিয়া, ঢাকা থেকে

ওড়না চোর

- ডা. সুভাষ চন্দ্র সেন

বাংলাদেশ বিমান থেকে সন্ধ্যা সাতটায় কলকাতা এয়ারপোর্ট দমে দম নামলাম। এই প্রথম ইনডিয়া সফর আমার। ওখান থেকে সোজা শিয়ালদহে মহাত্মা গান্ধী রোডে হোটেল *ইম্পিরিয়াল লজ*-এ চলে গেলাম।

যেহেতু তখন শারদীয় দুর্গা উৎসব, চারদিকে সাজ সাজ রব। পরদিন বের হলাম পূজো দেখতে। সন্ধ্যায় রুমে চলে আসি।

রাতে হোটেল বয় অনিমেষ বললো, স্যার, কোনোদিন নৌকা বাইচ দেখেছেন?

দেখেছি মানে একবার, দুবার নয়, পঞ্চাশবারের উপরে দেখেছি। কারণ আমার বাড়িটা চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া থানার পোমরায় এবং একেবারে কর্ণফুলি নদীর পাশেই ওই নদীতে প্রায়ই নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা হয়। শুধু তাই নয়, আমি নিজেও কয়েকবার নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছি। কারণ আমি ভালো বৈঠা ধরতে জাানি। তা আমাকে এটা জিজ্ঞাসা করছো কেন?

কাল বালী বৃজের নিচে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা হবে। আমরা একটা ছোট নৌকা ভাড়া করেছি। যদি যান আপনার জন্য একটা সিট রাখবো। আপনাকে বিশ টাকা দিতে হবে।

বললাম, ঠিক আছে রেখো।

পরদিন তিনটার সময় শ্যামবাজার হয়ে দক্ষিণেশ্বর কালীঘাটে চলে গেলাম। দেখি এক মাঝ বয়সী বুড়ো নৌকা নিয়ে তীরের কাছে চলে এলো। যদিও ছয়জনের সিট আমরা হলাম মাত্র চারজন। হোটেলের বাকি দুজন নাকি ছুটি পায়নি। তাই আসেনি।

যাক, মাঝিকে বললাম, নৌকা ছাড়ুন।

মাঝি নৌকা ছেড়ে চার পাচ গজ যাওয়ার পর তীর থেকে ডাক শুনতে পেলাম ও নরেনকাকা, ও নরেনকাকা, আমাকে তুলুন।

মাঝি নৌকা একটু ধীর গতি করলো।

এর মধ্যে অনিমেষ চেচিয়ে বলে উঠলো, কি মাঝি, আমাদের ভাড়া করা নৌকা, এখানে অন্য লোক ওঠানো যাবে না। চালাও মাঝি।

বললো, ঠিক আছে।

এদিকে মেয়েটি চেচাচ্ছে।

অনিমেষকে বললাম, মেয়েটি এতোই যখন চেচামেচি করছে, নৌকা, নাও না। আর সিট তো খালি আছে।

স্যার, আপনি বললে নিতে পারি।

অনিমেশ বললো, মাঝি নৌকা ভেড়াও।

নৌকা ভিড়লো। অমনি মেয়েটি বলে উঠলো, এই মাঝি, নৌকা ভেড়াতে এতো দেরি হলো কেন?

মাঝি কিছু না বলে শুধু আমাদের মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

এর মধ্যে অনিমেষ কিছু বলবে। তাকে থামিয়ে জবাব দিলাম, দেরি হচ্ছে মানে? এটা কি আপনার ভাড়া করা নৌকা নাকি? মাঝিকে বললাম, মাঝি, তাকে তুলো না। চালাও নৌকা।

মাঝি নৌকা চালাবে ঠিক এমন সময় মেয়েটি বলে উঠলো, প্লিজ, ক্ষমা করুন, বুঝতে পারিনি ওটা আপনাদের ভাড়া করা। কোনো দিন দেখিনি নৌকা বাইচ। তাই কল্যাণী থেকে চলে এসেছি। প্লিজ, একটু তুলুন না।

অনিমেষ বললো, না স্যার, তোলার দরকার নেই। কেমন ঝগড়াটে মেয়ে।

তাকে ফিস ফিস করে বললাম, চুপ থাকো, নৌকায় আসতে বলো।

এর মধ্যে মাঝিও একটু রিকোয়েস্ট করলো, স্যার, তুলুন না তাকে, আমি চিনি, আমাদের পাশের গ্রামের উপেন চৌধুরীর মেয়ে।

গম্ভীরভাবে বললাম, ঠিক আছে তোলো।

মেয়েটিকে নৌকায় তুলে নদীর মাঝখানের দিকে চালাতে লাগলো। কিছু দূর যাওয়ার পর রশির মাথায় পাথর বাধা। ওটা নদীতে ফেলে নোঙ্গরের মতো করে নৌকা বাধা হলো।

দশ পনেরো মিনিট পর শুরু হলো নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা। প্রায় ছয় সাতটি পাড়ি হলো প্রতিযোগিতা।

এবার আমাদের ফেরার পালা। এরই মধ্যে অনিমেষ মেয়েটির থেকে বিশ টাকা নিয়ে নিল।

ঘণ্টা খানেক হয়ে গেল মেয়েটি কোনো কথাই বলছে না। হঠাৎ আমার মাথায় একটা দুষ্টুমি এলো। উঠে দাড়ালাম। নৌকার দুদিকে দুই পা দিয়ে যে দোলাতে লাগলাম। অমনি মাঝিসহ সবাই অবাক হয়ে বলতে লাগলো, করছেনটা কি, করছেনটা কি?

হাসতে লাগলাম।

ছেলেগুলো প্রথমে চুপ ছিল, একটু প্রশ্রয় পেয়ে ওরা বলে উঠলো, স্যার, আরো জোরে। কিন্তু মেয়েটি একেবারে হাউমাউ শুরু করতে করতে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। মুখে শুধু একটাই শব্দ প্লিজ, প্লিজ আর নয় আর নয়।

মাঝিও দেখি রসিক। একটু হেসে হেসে বলতে লাগলো, কি স্যার, না তুললে কি এই মজা পেতেন?

বললাম তুমি চুপ করো, এখানে তুমি মজার কি দেখতে পেলে?

না মানে, এই জড়াজড়ি আর কি!

আমি নৌকা দোলানো বন্ধ করিনি। দেখি এমনভাবে ধরেছে, ওই ধরার মধ্যে আমার বুকের ওপর বমি করে দিচ্ছে। এই বমি দেখে নৌকা দোলানো বন্ধ করলাম, কিছুতেই তার হাত ছাড়াতে পারছি না এবং দেখছি কাদছে। বললাম, এই যে, হাত ছাড়ুন এবং বমিগুলো মুছে দিন।

বমির কথা শুনে দেখি হাত ছাড়লো। ওখান থেকে পানি নিয়ে ধুইয়ে দিতে লাগলো, ধোয়ার পর ভেজা শার্ট প্যান্টের ওপর ওড়না দিয়ে ঘষে ঘষে মুছতে লাগলো।

বললাম, ঠিক আছে, আমাকে দিন, আমি মুছি। এই বলে ওড়না দিয়ে মুছতে লাগলাম।

এরই মধ্যে নৌকা তীরের কাছে ভিড়লো।

সে বললো, আপনার নাম?

নাম বললাম। আপনার নাম?

আমার নাম লীলা, এই বলে লীলা উঠে দাড়ালো এবং বললো, আপনারা বসুন। ওই যে দোকানটা দেখছেন ওটা আমার মামার। ওখান থেকে আমি সন্দেশ নিয়ে আসছি। এই বলে উপরে চলে গেল।

আমার মনে একটু ভয় জাগলো। হঠাৎ একটা কথা মনে মনে চিন্তা করলাম। নৌকায় মেয়েটাকে ওই রকম করাতে হয়তো পরিচিত কাউকে ডাকতে যাচ্ছে।

অনিমেষকে বললাম তোমরা বসো, আমিও তার সঙ্গে যাচ্ছি। এ বলে ওড়নাটা নিয়ে সোজা তার বিপরীত দিকে চলে গেলাম। দুইশ তিন নাম্বার বাস ধরে দম দম জংশন। ওখান থেকে অটোতে করে হোটেলে চলে আসি।

ওই দিন রাত প্রায় আটটার দিকে হোটেলের ছেলেরা অনিমেষসহ রুমে এসে প্রায় এক কেজির মতো সন্দেশ হাতে দিয়ে বললো, স্যার, আপনি চলে এলেন কেন, মেয়েটি সন্দেশ নিয়ে এসে আপনার জন্য এক ঘণ্টা অপেক্ষা করেছে এবং আধঘণ্টার মতো কেদেঁছে, কাজটা স্যার, আমার মনে হয় ভালো হয়নি।

তখন নিজকে অপরাধী মনে হলো, না মানে, আমার খেয়ালই ছিল না যে পাচটার সময় আমার একটা লোকের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। তা মনে হওয়াতেই তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। বাধ্য হয়ে এই মিথ্যা কথাটা বললাম।

তা সন্দেশ কোথায়? দাও দেখি। ওখান থেকে একটা খেলাম। বাকিগুলো তাদেরকে দিয়েছিলাম।

কিছুক্ষণ পর অনিমেষ এসে বললো, স্যার, আপনি কি ওই মেয়েটির ওড়না নিয়ে এসেছেন?

কেন রে?

মেয়েটি বললো, তোমার স্যার আমার ওড়নাটা চুরি করে নিয়ে গেছে। তোমার স্যারকে বলবে, ওটার প্রতি আমার কোনো দাবি নেই। ওটা তাকে রেখে দিতে বলো। স্যার, সত্যিই কি আপনি ওড়না চুরি করেছেন?

আরে না না, ওর ওড়না নিয়ে আমি কি করবো। আমি তো বিয়ে করেনি যে, ওটা নিয়ে বৌকে দেব।

স্যার, মেয়েটা আপনার ঠিকানা চেয়েছে। আমি আপনার একটা কার্ড দিয়েছি।

অনিমেষের সঙ্গে এ ব্যাপারে আর কোনো কথা বলেনি।

দেশে চলে আসার পর লীলার একটা চিঠি পেলাম। প্রেম নিবেদন করে ওই চিঠিতেও লীলা আমাকে *ওড়না চোর* হিসেবে সম্বোধন করেছে এবং রাগ না করার জন্য বারণ করেছে।

চিঠি পড়ে ভালো লাগলো। তাহলে আমি কি সত্যিই ওড়না চোর?

রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম থেকে

দুঃস্বপ্ন

- এস.এম মুকিম চিশতী সুজন

প্রচণ্ড ব্যথায় ঘুম ভাঙলো।

শয়তানের বাচ্চাটা সবাইকে লাথি মেরে ঘুম ভাঙাচ্ছে।

শালা চু...ভাই।

আজাদকে প্রশ্ন করলাম, ফাজিলটা এমন করছে কেন?

সে এই কথার উত্তর না দিয়ে বললো, তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নে। আমরা এখনই বের হবো।

মুহূর্তেই নিজের অজান্তে বুকের ভেতর থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস পড়লো। আজ সেই দিন যার জন্য দীর্ঘ এক মাস যাবৎ কোরিয়ান পুসান পোর্টে অপেক্ষা করছিলাম। আমার সঙ্গে আছে আরো চৌত্রিশজন। উদ্দেশ্য নৌপথে কোরিয়া থেকে জাপান পাড়ি জমানো।

আমাদেরকে একটি এপার্টমেন্টের একতলায় রাখা হয়েছে। কোলাহলমুক্ত নির্জন এলাকা। সন্ধ্যা হলেই কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না। আর এখন তো রাত দেড়টা। মনে হচ্ছে পুরো পৃথিবীটাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমাদের দেশে এমন পরিবেশে হয়তো ঝি ঝি পোকার ডাক শোনা যেতো। কিন্তু এখানে তাও নেই। এখানে আমাদের কথা বলা নিষেধ, হাটা-চলাও নিষেধ। তাই শুধু বাতাসে নিঃশ্বাসের শব্দ। এখানে যদি কেউ ভুলেও কথা বলে তাহলে তার জন্য ছিল ভয়ংকর শাস্তি।

একবার রহমান জানতে চেয়েছিল, আমাদের এখান থেকে কবে নেয়া হবে?

এর জন্য তাকে ইলেকট্রিক শক দেয়া হলো।

সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য। কিন্তু আমরা কোনো প্রতিবাদ করতে পারিনি। কারণ তারা ছিল সশস্ত্র। তারপর থেকে আমরা কথা বলা ভুলে গেলাম। আমরা পয়ত্রিশজন সারা দিনরাত পড়ে থাকতাম মূর্তির মতো। কোনো কাজ নেই, কথা নেই, শুধু চুপচাপ বসে থাকা। কেউ কেউ বাবা-মা, ভাই-বোন অথবা কোনো প্রিয়জনকে চিঠি লিখতো। কিন্তু সে চিঠি কখনো পোস্ট করা হতো না।

আজ এক মাস পরে বন্দী জীবনের মুক্তি হচ্ছে। ভাবতেই ভালো লাগছে। ভীষণ ভালো লাগছে।

আমাদের নিতে এসেছে পাচজন কোরিয়ান। এদের মধ্যে একজন হচ্ছে লি কুরিবালা যার তত্ত্বাবধানে আমরা ছিলাম। এরা সবাই মাফিয়া চক্রের সঙ্গে জড়িত এবং সবার কাছেই ভারী অস্ত্র। বাইরে একটা শাদা মাইক্রোবাস অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। মাঝারি গোছের শাদা গাড়ি। গ্লাসগুলো সম্পূর্ণ কালো। বাইরে থেকে ভেতরের কিছু দেখা যায় না। গাড়িটির আরেকটা বৈশিষ্ট হচ্ছে ভেতরে কোনো সিট নেই। তাই সবাইকে বাধ্য ছেলের মতো মেঝেতেই জবুথবু হয়ে বসতে হলো।

আনুমানিক ঘণ্টা দুই গাড়ি চলার পর থামলো। গাড়ি থেকে নেমেই প্রথমে চোখে পড়লো একটা শান্ত নদী আর তার পাড় ঘেষে দাড়িয়ে আছে ছোট একটি মাছ ধরার ট্রলার। সেই ট্রলার দিয়েই শুরু হলো আমাদের নৌযাত্রা। ট্রলারে উঠে নিজেদেরকে কোরবানির গরু মনে হচ্ছিল। কারণ আমাদের দেশে কোরবানি ঈদে ট্রলারে এভাবেই গরু ঢাকায় আনা হয়।

যাহোক, ঘণ্টা খানেক পরে আমরা ছোট নদী পেরিয়ে সাগরের বুকে একটা বড় জাহাজের কাছে এসে থামলাম। তারপর এক এক করে সবাই সিড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম। উপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদেরকে জাহাজের পাটাতনের নিচে নামিয়ে দেয়া হলো। তখনো আমরা বুঝতে পারিনি যে, আমাদের জন্য ভয়ংকর কিছু অপেক্ষা করছে।

জাহাজের পাটাতনের নিচটা বড় ম্যানহোলের ঢাকনার মতো ঢাকনা দিয়ে বন্ধ ছিল। ঢাকনাটি খুলে সবাই নিচে নামলাম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঢাকনাটি বন্ধ করে দেয়া হলো। নিমেষেই হারিয়ে গেলাম অন্ধকারে। তারপর কতোটা সময় অন্ধকারে বসেছিলাম জানা নেই। অযুত, নিযুত, লক্ষ বছর হবে হয়তো।

বসে বসে বাবা-মা, ভাই-বোনের কথা ভাবছিলাম। জীবনের কতোটা বছর তাদের সঙ্গে কাটিয়েছি, কতো সুখ-দুঃখের ভাগ নিয়েছি। অথচ আজ চোখ বন্ধ করে তাদের মুখ দেখার চেষ্টা করেও পারছি না। পরিস্থিতি মানুষকে কতোটা অসহায় করে দেয়! এসব ভাবতে ভাবতে উপরে ঢাকনা খোলার শব্দে চমকে উঠলাম। মনে হচ্ছিল যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। কিন্তু না, তারা শুধু জানতে চাইলো আমরা ঠিক আছি কি না। তারপর হতাশ করে আবার ঢাকনাটি বন্ধ করে দেয়া হলো।

আমরা আবারও হারিয়ে গেলাম সময়ের অতল গহ্বরে। উপরে কিছুক্ষণ মালপত্র সরানোর শব্দ হলো। তারপর আবার নিস্তব্ধ। মনে হচ্ছিল সময় যেন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। আনুমানিক পনেরো বিশ মিনিট পরে অনেকগুলো পায়ের শব্দ পেলাম। বুঝতে বাকি রইলো না যে, উপরে কাস্টমস চেকিং হচ্ছে। কিন্তু তাদের প্রতিটি পা যেন আমাদের বুকের ওপর দিয়ে হেটে যাচ্ছে। নিজেকে দিয়েই বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, সবাই ভয়ে স্তম্ভিত।

উপরে উঠে দেখি জাহাজ চলছে। কখন যে জাহাজ ছাড়লো একদমই টের পাইনি। যখনই ছাড়ুক প্রচণ্ড ভালো লাগছে। পাশের ক্যাবিনে হই চই-এর শব্দে এগিয়ে গেলাম।

রাতুল কাদতে কাদতে বলছিল, দুজনকে পাওয়া যাচ্ছে না।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুই তিনজন আবার নিচে নামলাম। দুজনকে খুজেও পেলাম। কিন্তু মৃত অবস্থায়। অক্সিজেনের অভাবে প্রাণ দিতে হলো দুজনকে।

রাতুলের কান্না কিছুতেই থামানো যাচ্ছিল না। কি করে থামবে, দুজনের একজন যে রাতুলের ছোট ভাই! শোকে–দুঃখে আমরা সবাই ক্লান্ত। শুধু অপেক্ষার দিন গুণছিলাম কখন জাহাজ থামবে, কখন জাপান নামবো, কখন চিৎকার করে কথা বলতে পারবো, কখন আবার জীবন স্বাভাবিক হবে।

এভাবেই কষ্ট করে দুইবেলা খেয়ে না খেয়ে কাটিয়ে দিলাম চার দিন। পঞ্চম দিনে আমাদেরকে আবার পাটাতনের নিচে নামতে বলা হলো। আমরা অবশ্য রাজি হচ্ছিলাম না। কিন্তু অস্ত্রের সামনে আমাদের বিদ্রোহ টিকলো না। বাধ্য হলাম নিচে নামতে। আমার এক পাশে আজাদ এবং অন্য পাশে রাতুল। সবাই এক মনে দোয়া–দরুদ পড়ছিলাম।

রাতুল আমার কানের কাছে এসে ফিশ ফিশ করে বললো, বন্ধু, আমার একটা চিঠি তোর কাছে রাখ। যদি কখনো আলো না দেখি তাহলে চিঠিটা পোস্ট করে দিস।

রাতুলের আবেগ জড়ানো সে কথায় বুকের গভীরে প্রচণ্ডভাবে স্পর্শ করলো। কিন্তু বিশাল সাগরের বুকে আমার চোখের দুই ফোটা পানি কারো চোখে পড়েনি।

লি কুরিবালা আমাদেরকে উপরে উঠে আসতে বললো।

বুঝলাম আমরা জাপানে পৌছে গেছি। কিন্তু এবার আমরা পাচজনের বেশি উঠে আসতে পারলাম না। বাকিরা হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

তিন বছর জাপান থাকার পরে ফিরে এসেছি নিজের দেশে, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি মাত্র পাচ দিনের নৌপথ ভ্রমণের স্মৃতি যা আমার কাছে এখনো দুঃস্বপ্ন।

আমরা যে পাচজন বেচে এসেছি তার মধ্যে রাতুল একজন। আজ তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। আমরা আবারও হারিয়ে গেছি সময়ের মাঝে।

বন্ধু, তুমি যেখানেই থাকো না কেন, তোমার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিছু স্মৃতি এবং তোমার জন্য আছে ভালোবাসা ও সমবেদনা।

গোপীবাগ, ঢাকা থেকে

ঝাপ

- রফিকুন্নেসা হুদা

আমার বাড়ি ভোলা। সরকারি কর্মচারী বাবার বদলির সূত্রে আমরা দেশের বিভিন্ন জায়গায় থাকলেও প্রতি বছরই আমাদের একবার ভোলা যেতে হতো। আমার দাদি–চাচা–ফুপু–মামা সবাই তো সেখানে।

ভোলা শহরের কালিবাড়ি রোডেই আমাদের বাড়ি। তখনকার সময়ে ভোলার যাতায়াত ব্যবস্থা এখনকার মতো সরাসরি ঢাকা–ভোলা লঞ্চ ছিল না। ছোটবেলার বরিশাল থেকে স্টিমারে প্রলয়ংকরী মেঘনা পাড়ি দিয়ে ভোলা যাওয়ার স্মৃতি এখনো অম্লান। পরবর্তীকালে ভোলা থেকে লঞ্চে বরিশাল এসে ঢাকার লঞ্চ–স্টিমার ধরতে হতো। এখন তো ঢাকা–ভোলা লঞ্চ, নদীপথে যাতায়াতের কতো সুবিধা। নদীপথে যাতায়াতের বহু স্মৃতির মধ্যে চাদপুর থেকে পদ্মা মেঘনার মিলনরেখা শাদা–কালো পানি, নোনা পানি, মিঠা পানির স্মৃতি এখনো চোখে ভাসে।

ষাটের দশকে বাবা যখন তার পুলিশ বিভাগের চাকরি থেকে অবসর নিয়ে স্থায়ীভাবে ভোলা চলে এলেন আমি তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির অনার্সের ছাত্রী। তখন থেকে আমি ঢাকা–ভোলার নিয়মিত যাত্রী। কিন্তু আমাকে তখনো বরিশাল থেকে ছোট লঞ্চেই ভোলা যেতে হতো।

বরিশাল থেকে ভোলা যেতে একটা নদী ছিল। নাম কালাবদর। প্রবাদ ছিল এমন – *যদি নড়ে মানুষের দাড়ি, কালাবদর দিওনা পাড়ি।* অর্থাৎ সামান্যতম বাতাস যা কেবল মানুষের দাড়ি নাড়ায়, তবুও কালাবদর পাড়ি

দেবে না। বড় ভয়ংকর সে নদী। অবশ্য এখন সে তেজ নেই। ভোলার সব মানুষ এই কালাবদরের কথা জানে।

ষাট দশকের মাঝামাঝি সময়ে আমার অনার্স পরীক্ষা শেষ। বাবা আমাকে ঢাকা থেকে ভোলা নিয়ে এলেন। আমি থাকতাম তখনকার ছাত্রী হল বর্তমানের রোকেয়া হলে।

গ্রামের আসার কিছু দিন পরই বিনা নোটিশে হঠাৎ করেই আমার বিয়ে হয়ে গেল। আমার বাবার নতুন জামাতা বাবাজি ঢাকা থেকেই ভোলা এসেছিলেন বিয়ে করতে। এবং ওই কালাবদরের মাঝখানে তাকে যথেষ্ট নাকানি-চুবানি খেতে হয়েছিল। এ জন্য বাসায় এসেই তার প্রথম কথা ছিল, এরই নাম শ্বশুরবাড়ি!

বিয়ের পনেরো দিন পর আবার ঢাকায় যাচ্ছি। আমার মাস্টার্স ক্লাস শুরু হবে। হলে চলে যেতে হবে। এবার সহযাত্রী আমার বাবা নয়। আমার স্বামী, তার ছোট এক ভাই, আমার ছোট ভাই সান্টু ও চাচাতো ভাই বাকিবিল্লাহ।

ভোলার ঘাট থেকে লঞ্চে উঠলাম। ছোট্ট এক তলা লঞ্চ। তখন খেয়াঘাটে লঞ্চের ব্যবস্থা ছিল না। কালাবদর পাড়ি দেয়ার আগে একটা চরের কাছে এসে হঠাৎ আমাদের লঞ্চটা বিকল হয়ে গেল। আর কিছুতেই চলছে না। এ চরটাতে এই লঞ্চটা থামার কথা ছিল। কিন্তু লঞ্চ আসতে পারছে না। সামনে কালাবদর। সবার মুখ শুকিয়ে গেল। দোয়া-দরুদ পড়া শুরু হয়ে গেল। এর মধ্যে দেখা গেল অন্য একটা লঞ্চ এখান থেকেই ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আমাদের সারেং তাকে ডেকে আমাদের অসুবিধার কথা জানালেন।

সঙ্গে সঙ্গে তীরের এবং অন্য লোকজন সবাই সচেতন হয়ে গেল।

সেই লঞ্চের সারেং তখন বললো, খুব জরুরি কাজ যাদের নেই তারা দয়া করে নেমে যান, পরবর্তী লঞ্চে আসবেন।

দেখলাম কয়েকজন যাত্রী নেমে গেলেন।

সেই লঞ্চ আস্তে আস্তে আমাদের লঞ্চের কাছে এলো। তখন সকাল দশটা অথবা এগারোটা। এমনই হবে হয়তো বা। নদীর ঢেউ আস্তে আস্তে বাড়ছে, জোয়ারের সময় ঘনিয়ে আসছে। লঞ্চ কাছে আসতেই এ লঞ্চের সবাই লাফিয়ে লাফিয়ে চলে গেল ওই লঞ্চে।

বিপত্তি ঘটলো আমার বেলায়। আমার পরনে শাড়ি। কি করে এতো লোকের সামনে লাফ দেবো! লঞ্চে কোনো সাকোও দেয়নি। আমি তো ঠায় দাড়িয়ে থাকলাম। লঞ্চ দুলছে। এক লঞ্চের লোক অন্য লঞ্চকে ধরে রেখেছে।

আমার লম্বা-চওড়া, বলিষ্ঠ, সুপুরুষ স্বামী ওই লঞ্চ থেকে হাত বাড়িয়ে বললো, দাও লাফ আমি ধরবো। মরলে দুজন এক সঙ্গেই মরবো।

সেই সময়ের সদ্য বিবাহিতা আমি এতো লোকের সামনে স্বামীর হাতে ঝাপ দেবো এ কথা ভাবতেই পারছি না। সেই সময়ের আমি মৃত্যুকে সামনে রেখেই লজ্জা-সংকোচে মরে যাচ্ছি। আমার দুই ভাই আমার স্বামীর পাশে দাড়িয়ে তাকে ঘিরে আছে যাতে আমি লাফ দিলে পড়ে না যাই।

আমার দেবর হারুনভাই আমাকে আগলে আছে যেন ব্যালান্স না হারাই। কিন্তু আমি পারছি না।

এদিকে নদীর পানি ক্রমেই বাড়ছে। খালি লঞ্চে কেবল আমি আর হারুনভাই।

লোকজন সবাই আতংকিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

মুরুব্বি গোছের লোকজন বলছেন, মা, লাফ দাও আল্লাহ ভরসা, ভয় নেই।

অন্যরা বলছে, আপা, লাফ দেন, ভয় নেই, আমরা আছি।

হঠাৎ একটা বড় ঢেউ এদিকে আসতে শুরু করলে সবাই শঙ্কিত হয়ে পড়লো।

মৃত্যু ভয় সবারই আছে।

একজন বুড়ো মানুষ চিৎকার করে বললেন, মাগো, আল্লাহর দোহাই, লাফ দাও।

আমার স্বামী হাত বাড়িয়ে বললেন, আর সংকোচ নয়, লাফ দাও।

চোখ–কান বন্ধ করে আল্লাহর নাম নিয়ে দিলাম একটা ঝাপ।

মানুষটা আমাকে ঠিকই দুই হাত আগলে ধরে ফেললো।

আমার পায়ের ধাক্কায় লঞ্চটা দুলে উঠে সরে গেল।

এ লঞ্চের সবাই ওই লঞ্চটাকে ছেড়ে দিয়ে ধরে রেলিং ধরে দাড়িয়ে থাকলো।

সেই বড় ঢেউটা এসে আছড়ে পড়লো আমাদের লঞ্চে। অনেকেই ভিজে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লঞ্চ চলতে শুরু করলো।

লঞ্চ ছেড়ে দিল। সমস্ত মানুষ যেন হাপ ছেড়ে বাচলো। লঞ্চের একটি মানুষও নড়ছে না। সবাই রেলিং ধরে দাড়িয়ে থাকলো আর আল্লাহকে ডাকতে লাগলো। এক তলা ছোট্ট লঞ্চ, দুই লঞ্চের মানুষ এক লঞ্চে।

কতোক্ষণ যে এভাবে দাড়িয়ে ছিলাম জানি না। কারণ লাফ দিয়ে সেই যে মানুষটাকে আকড়ে ধরলাম আর কেউ কাউকে ছাড়িনি।

লঞ্চ যখন ঠিক মতো চলতে শুরু করলো তখন সারেং বললেন, এবার একজন একজন করে আপনারা আস্তে আস্তে জায়গা মতো বসেন। নদী পাড়ি দেবো।

আমার স্বামী বললো, চলো।

এবার আমরা সবাই নিচে গিয়ে বসলাম।

সব মানুষ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে যেন অভয় দিচ্ছিল।

কেবল হারুনভাই বললো, একটা চমৎকার সিনেমা হলো। দুর্ভাগ্য সঙ্গে ক্যামেরা নেই।

লঞ্চ আস্তে আস্তে কালাবদর পাড়ি দিয়ে বরিশালের দিকে এগিয়ে চললো।

ঢাকা থেকে

জ্যামে

প্রেম করতাম এক মেডিকাল পড়ুয়া ছাত্রের সঙ্গে। আমি অন্য একটা মেডিকালের ছাত্রী। কিভাবে প্রেম হলো সেদিকে যাবো না। একদিনের ডেটিংয়ের ঘটনা আমার জীবনকে তছনছ করে দিয়েছে। সেটাই আজকের লেখার বিষয়।

এর মধ্যে ফাহিম (প্রেমিকের নাম) ইন্টার্নিশিপ শেষ করে একটা ক্লিনিকে চাকরি করছে। আমি ফাইনাল পেশাগত পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্টের অপেক্ষায়। এক সপ্তাহের মধ্যে রেজাল্ট দেয়ার কথা। এর আগে একবার পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছি দুই বিষয়ে। তাই খুব চিন্তায় আছি।

হঠাৎ ফাহিমের ফোন, ফারহীন বেড়াতে যাবে?

বললাম, কোথায়?

চাদপুর। লঞ্চে যাবো। পদ্মা, মেঘনা ও তার দুই কূলের সৌন্দর্য দিনের বেলা উপভোগ করা যাবে। ফাহিমের উত্তর।

সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে ফিরতে পারলে রাজি আছি। বললাম।

ফাহিম রাজি হলো।

কথা মতো সকাল সাড়ে সাতটায় মিরপুরের বাসা থেকে বের হলাম। মাকে বললাম, আজ রেজাল্ট পাওয়া যেতে পারে। তাই কলেজে যাচ্ছি।

শাহবাগ থেকে ফাহিমকে বেবিট্যাকসিতে তুলে নিলাম। সদরঘাট যেতে যেতে সাড়ে আটটা বেজে গেল। ফলে আটটার লঞ্চ না পেয়ে নয়টার লঞ্চে উঠলাম।

ফাহিম একটা ডাবল ক্যাবিন ভাড়া নিল।

আমরা ক্যাবিনে ঢুকে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। আমার মনের ভেতর একটা শিহরণ খেলা করছিল। কেননা আমি এই প্রথম লঞ্চ ভ্রমণে যাচ্ছি।

লঞ্চ ছেড়ে দিল। আমরা ফ্রেশ হয়ে সকালের নাশতা খেয়ে নিলাম। লঞ্চ বুড়িগঙ্গার ওপর দিয়ে দ্রুত গতিতে চলছে। আমি আর ফাহিম রেলিং ধরে দাড়িয়ে বুড়িগঙ্গা ও তার দুইপাশ দেখছি। আমার খুব ভালো লাগছে।

ফাহিম বরিশালের ছেলে। সব সময় লঞ্চে যাতায়াত করে। তাই তার কাছে বিস্ময়কর কিছু মনে হচ্ছে না। কিন্তু আমার কাছে এক অন্য রকম জগৎ। খুবই ভালো লাগছে। লঞ্চ ভ্রমণ নিয়ে যতো ভয় ছিল, আস্তে আস্তে সব কেটে গেল।

লঞ্চ মুন্সিগঞ্জ ছাড়ার পর আমরা ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করে গল্প করছি। ফাহিম আমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে। তার চোখ মুখে কেমন যেন অন্য রকম অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। আমাকে তার কাছে শুয়ে দিয়ে আমার কপাল, গাল ও মুখে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল। কেমন যেন জড়বস্তুর মতো চুপ করে তার পাগলামি উপভোগ করছি। কোনো বাধা দিতে পারলাম না। কেমন একটা ভালো লাগায় ডুবে গেলাম। এক সময়ে চরম উত্তেজনাকর মুহূর্ত পার করে বাস্তবে ফিরে এলাম।

খুব কাদলাম।

ফাহিম আমাকে সান্ত্বনা দিল।

দুপুর একটার সময় চাদপুর পৌছালো। নেমে রিকশা নিয়ে বাসস্ট্যান্ডে এলাম। দুটোর আগে কোনো বাস ছাড়বে না। তাই দুটোর বাসের টিকেট কেটে মাকে ফোন করলাম। আমার আসতে দেরি হবে, চিন্তা করবেন না। রাস্তার পাশে একটা হোটেলে ঢুকে লাঞ্চ করলাম।

সোয়া দুটোয় বাস ছাড়লো ঢাকার উদ্দেশ্যে। কচ্ছপ গতিতে বাস এগুতে লাগলো এবং প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডে পাচ দশ মিনিট করে থামতে লাগলো। আমার হৃৎপিণ্ডের একেকটা করে বিট মিস হতে লাগলো। কিভাবে সন্ধ্যার আগে বাসায় পৌছাবো এই চিন্তায় আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। চুপচাপ বসে রইলাম। শুধু কান্না পাচ্ছিল।

কাচপুর আসতে আসতে সন্ধ্যা ছয়টা। সামনে বিশাল জ্যাম। বাস আর এগোচ্ছে না। আমি যেন জীবন্ত লাশ হয়ে গেলাম। আমার ফ্যামিলি যথেষ্ট কনজারভেটিভ। জীবনে কখনো সন্ধ্যার পর একা বাসার বাইরে থাকিনি। একেক মিনিট যায়, অমনি মায়ের চিন্তাক্লিষ্ট মুখখানি ভেসে ওঠে। বাবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় পায়চারী অনুভব করি। না জানি আজ কপালে কি আছে? এসব ভাবতে ভাবতে আটটার দিকে যাত্রাবাড়ী এসে পৌছালাম। ফাহিমকে বললাম, বাসায় ফোন করো, বাসার পরিবেশটা আচ করার চেষ্টা করো।

ফাহিম ফোন করে বললো, বাসার সবাই মনে হয় খুব অস্থিরতার মধ্যে আছে।

স্কুটার পাচ্ছিলাম না। কেউই মিরপুর যেতে চাচ্ছে না। তখন তো আমার মনের ভেতর হাতুড়ি পেটার শব্দ হচ্ছিল। অনেকক্ষণ পর একটা বেবিট্যাকসি যেতে রাজি হলো। একটু সামনে এগোনোর পর দেখি শুধু জ্যাম আর জ্যাম। আস্তে আস্তে শাহবাগ এসে দেখি বিশাল জ্যাম, মনে হচ্ছে এ জীবনেও ক্লিয়ার হবে না। তাই কাটাবন হয়ে হাতিরপুল এলাম। এখানেও একই অবস্থা। নেমে বাসায় ফোন করলাম।

হ্যালো আব্বা, আমি আধা ঘণ্টার মধ্যে বাসায় আসছি। এসে সব কিছু বলবো। বাবাকে কোনো প্রশ্ন করতে দিলাম না।

এবার রিকশা নিয়ে ভুতের গলি, গৃন রোড হয়ে পান্থপথ এলাম। এখানেও কোনো স্কুটার পেলাম না। রাজাবাজারের ভেতর দিয়ে সংসদ ভবনের পূর্ব কর্নারে এলাম। কোনো বেবিট্যাকসি পাচ্ছিলাম না। একেকটা মিনিট মনে হচ্ছে একেকটা ঘণ্টা। অবশেষে একটা বেবিট্যাকসি পেলাম।

ফাহিমকে বললাম, চলো, বাবার মায়ের সামনে দাড়াই। সব কিছু আমি ম্যানেজ করবো।

সে রাজি হলো না। বললো, আজকে সামলাও। চার পাচ দিনের মধ্যে আসবো।

মনের দুঃখে তার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। ফাহিমকে কাজিপাড়া নামিয়ে দিলাম। বাসায় পৌছাতে রাত দশটা বেজে গেল। দেখি মা অজ্ঞান। তাকে হাসপাতালে নেয়া হচ্ছে। সাত দিন পর ফিরে এলেন শরীরের ডান পাশ প্যারালাইসিস নিয়ে।

বাবা বললেন, কি হয়েছিল বলো।

মিথ্যা বলতে বাধ্য হলাম। পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হয়েছে শুনে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে হাসপাতালে। জ্ঞান ফিরে দেখি রাত সাড়ে আটটা। তাই এতো দেরি।

সবাই বিশ্বাস করছে বলে মনে হলো।

কিন্তু মনে শান্তি পাচ্ছিলাম না। মায়ের এ করুণ পরিণতির জন্য শুধু আমিই দায়ী। ভাবতেই আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে।

সেদিনের পর ফাহিমের আর খবর পাইনি। একদিনও ফোন করে জানতে চায়নি, কিভাবে সামাল দিয়েছিলাম সেদিনের পরিস্থিতি।

বুঝে গেছি আমাকে তার প্রয়োজন নেই। তাই আর তাকে খুজিনি। মাঝে মধ্যে মনে হয় তার ওপর প্রতিশোধ নিই। কিন্তু পারি না। কারণ তাকে প্রচণ্ড ভালোবেসেছিলাম।

আমার এ লেখার একটাই কারণ সব মেয়েদের সতর্ক করার জন্য। তারা যেন বিয়ের আগে দৈহিক সম্পর্ক এড়িয়ে চলে। এবং খুব দূরে কোথাও ডেটিংয়ে না যায়। তাহলে ভালোবাসার মানুষকে হারাবে না।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

কোদালপুরের ডাকাত

- মোহাম্মদ সাইদুর রহমান

১৯৮৮ সালের ঘটনা। আমি ক্লাস সিক্সের ছাত্র। মেজ চাচার সঙ্গে দুইবার বিশ্ব ইস্তেমায় এসেছি। তৃতীয়বার চাচার উৎসাহে রওনা দিলাম। লঞ্চ হিজলা থানার কাইচমা নামের স্থানে। বাড়ি থেকে প্রায় পনেরো কিলোমিটার। লঞ্চ লোকারণ্য থাকে। ছাদে কোনো রকম ঠাই হয়। এর মধ্যে একটি মাছের ট্রলার মাইক লাগিয়ে ঘোষণা দিচ্ছে তাদের ট্রলার ঢাকা ইস্তেমার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে। অনেককেই উঠতে দেখলাম। আমরাও অনেক চিন্তা করে ওঠে পড়লাম।

ট্রলার কিছু দূর যাওয়ার পর বুঝতে পারলাম সারেং ততোটা অভিজ্ঞ নয়। প্রায় তিন ঘণ্টা চললো। জ্যোৎস্না রাত। গায়ে লেপ জড়িয়ে আছি। ভ্রমণটা চমৎকার উপভোগ করছি। হঠাৎ দেখলাম ট্রলার নদীর মাঝখানে একটি বাশের বেড়ার সঙ্গে লাগিয়ে দিচ্ছে। পেছনে নেয়ার চেষ্টা করেও কাজ হচ্ছে না।

অভিজ্ঞতার আলোকে একজন বললো, এটা দোলপুর, পুরো নদীতে বাশের বেড়া, একটি জায়গাই খোলা রাখা হয়েছে। তারা টের পেলে সব কিছু লুট করে নিয়ে যাবে।

ভয় পেলাম।

সবাই বললো, তাড়াতাড়ি ট্রলার পেছনে নিন। দূরে তাদের নৌকা দেখা যাচ্ছে।

কয়েকজন উদ্যোগী হয়ে অনেক কষ্ট করে ট্রলার বাশ থেকে নামানো হলেও তারা প্রায় কাছাকাছি চলে এলো। ট্রলারটি দ্রুত পেছনের দিকে চলতে লাগলো। এমনিভাবে প্রায় দুই কিলোমিটার পেছনে এলো। অন্য পথ ঘুরে আসতে হলে ছয় ঘণ্টা সময় বেশি লাগবে।

ইতিমধ্যে একটি লঞ্চকে দেখে ট্রলার পিছু নিল। বড় লঞ্চ ব্যবধান আবার প্রায় এক কিলোমিটার।

দুই একজন বললো, তারা আক্রমণ করতে পারে।

ভয় ঢুকে গেল। কি করবো! আল্লাহকে ডাকছি, একটি মহৎ কাজের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম, অথচ ডাকাতের ভয়। এ ভীষণ অন্যায়।

ঠিকই বেড়ার নিকটবর্তী হতেই তিনটি নৌকা দিয়ে তারা পথ আটকালো। প্রথম নৌকাটি ধাক্কা খেয়ে দূরে ছিটকে পড়ে।

দ্বিতীয়টি থেকে বৈঠা দিয়ে যাত্রীদের ওপর আঘাত করতে লাগলো এবং দুই একজন ট্রলারে উঠেও গেছে। একজন সারেংয়ের কাছে চলে গেছে। নৌকাতে যেহেতু ইঞ্জিন ছিল না। ডাকাতরা নৌকাকে ট্রলারের সঙ্গে বাধতে পারেনি বিধায় নৌকাগুলো পিছু পড়লো এবং একজন ডাকাত নৌকাতে লাফিয়ে পড়লো। অপর ডাকাতকে ধর বলতেই উপর থেকে লাফিয়ে নদীতে পড়ে গেল। আমাদের মধ্যে দুই একজন আহত হলো।

অবশেষে দক্ষ একজন সারেং যে যাত্রী ছিল তার কল্যাণে আমরা পিছু না হটে কোদালপুর ডাকাতদের ঘের পার হলাম এবং সকাল নয়টা নাগাদ ঢাকা পৌছালাম যেখানে ভোর চারটায় ঢাকা পৌছার কথা। এ ধরনের নৌ ভ্রমণ জীবনের জন্য সত্যিই ঝুকি।

মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল থেকে

মহীয়সী

- কাব্য কামরুল

তখন যৌবনের উদয়ে ঝলমল আমার মনপ্রাণ। এক একটি স্বমেহনে সুখের আস্বাদন নতুনভাবে ধরা পড়ে আমার চেতনায়। অভূতপূর্ব সুখ ও বিস্ময় লাগে বিষয়টিকে। নিভৃতে নিজের সঙ্গে নিজের নিরবচ্ছিন্ন ভালোবাসা। একান্তই নিজের। যৌবনের বেশ কিছু দিন কেটে যায় পরম আনন্দে। এক সময় বিপরীত শরীরের প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ করি। বোধ করাটাই স্বাভাবিক এবং সুস্থ।

তিন বন্ধুর সিদ্ধান্ত হলো বানিয়াশান্তা পতিতাপল্লি যাবো। নেতৃত্বে আমাদের সিনিয়র বন্ধু ছগির। ছগিরভাই ছিলেন খুবই দুরন্ত এবং ডানপিটে। মাহবুবটা বেশ কৌতূহলী টাইপের ছেলে। তবে ভীরু। বানিয়াশান্তায় যাওয়ার উদ্দেশ্য নৌ ভ্রমণ এবং পল্লিতে একটু ঢু মারা। ছগিরভাই একটা ছোট নৌকার ব্যবস্থা করলেন। আনন্দে আমি ও মাহবুব অভিভূত।

নৌকার মূল বৈঠা বাইবেন ছগিরভাই। তিনি আবার বৈঠা বাইতে খুবই পারঙ্গম। ছগিরভাই বরিশালের ছেলে। তার ওপর আমাদের দারুণ ভরসা।

সকাল সকাল মংলা স্টিমার ঘাট থেকে নৌকা ছাড়া হলো। ছগিরের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও আনাড়ি হাতে বৈঠা চালাতে থাকি। জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দে নৌকার ছন্দময় চলা। খুশিতে আমরা টইটম্বুর। ছোট ছোট ঢেউয়ে দুলে ওঠে নৌকা। আহ! কি আনন্দ আকাশে বাতাসে। নৌকা যখন মংলা ও পশুর নদীর সঙ্গমস্থলের মধ্যে দিয়ে ছোটে তখন ভয়, রোমাঞ্চ ও অ্যাডভেঞ্চার মিলে সে এক অদ্ভুত অনুভূতি।

দুই ঘণ্টা পর আমরা কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌছালাম। নদীর উপকূলবর্তী সারি সারি কাচাঘর। রঙবেরঙের পোশাকে সজ্জিত মেয়েরা। আমাদের হার্ট বিট বেড়ে যায়। ছগির ও মাহবুব আপত্তি করলো। তারা কূলে

উঠবে না। যদি মেয়েরা আটকে রাখে কিংবা জোর করে এই ভয়ে। আমাকে তারা বললো, তুই গিয়ে একটু ঘুরে আয়। পল্লির দোকান থেকে কিছু খাবার জিনিস কেনাকাটা করবি এ ছুতোয় ঘুরে আসবি।

আমি শুধু কূলে উঠলাম। কয়েকজন মেয়ের আমার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি। দুজন তো ডাকাডাকি আরম্ভ করে দিল। তাদের ডাকার ধরন দেখে মনে হলো যেন আগের জানাশোনা।

আমার কাছে দ্রুত একজন মাঝ বয়সী মহিলা ছুটে এলেন। দেখতে বেশ সুন্দর। চোখে মুখে স্নিগ্ধতা।

মহিলা বললেন, এই খোকন, তোমাকে আমার পরিচিত মনে হচ্ছে। একটু এদিকে এসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

তার কথায় কিছুটা ঘাবড়ে গেলাম এবং তার ঘরের সামনের বেঞ্চিতে বসলাম।

মহিলা বললেন, তোমার নাম কি?

টুটুল।

এখানে কেন এসেছো?

এমনি, ঘুরতে।

এটা কি ঘোরার কোনো জায়গা হলো?

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি কোনো ভালো ঘরের ছেলে। এখানে আসাটা তোমার ঠিক হয়নি। তোমার বয়স কম। তোমার এখন কেবল পড়াশোনা করার সময়। এদিকে তোমার মনোযোগ চলে এলে পড়াশোনা ধ্বংস হয়ে যাবে। তুমি জানো, এখানে যারা থাকে তারা কোনো না কোনো যৌন রোগে আক্রান্ত। তুমি এইডস রোগের নাম শুনেছো?

লজ্জিত মুখে বললাম, না।

তিনি বললেন, এইডস একটি মারাত্মক যৌন রোগ। এ রোগের চিকিৎসা নেই। এখানের মেয়েরা জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত থাকতে পারে। এমনকি আমিও এইডস জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত থাকতে পারি। এইডস যৌন মিলনের মাধ্যমে একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে প্রবেশ করে। অবশ্য এইডস আক্রান্ত হওয়ার অন্যান্য কারণ আছে। এই পল্লিতে বিদেশি জাহাজের অনেক ক্রু আসে। তাদের মাধ্যমে অনেকের শরীরে এইডস-এর জীবাণু প্রবেশ করতে পারে। আমাদের পল্লিটা এইডস-এর জন্য খুবই ঝুকিপূর্ণ।

আমি কৌতূহলী হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি এতো কিছু জানেন কি করে?

তিনি বললেন, এখানে এনজিও কর্মীরা আমাদের যৌন রোগ সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে থাকে। তাদের কাছ থেকেই এসব জানা। যৌন রোগ প্রতিরোধের জন্য অনেকে আবার কনডম ব্যবহার করে। সে যাই হোক। এখন ঝড় আসার সম্ভাবনা। আকাশের অবস্থা ভালো নেই। তুমি কিভাবে এসেছো?

তাকে বিস্তারিত বললাম। মৃদু ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। নদী বেশ উত্তাল। এদিকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে।

মহিলাটি একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকার ব্যবস্থা করলেন।

আমাদের ছোট নৌকা ইঞ্জিনচালিত নৌকার পেছনে বাধা হলো।

নৌকার ভাড়া তিনিই দিলেন। বিদায় মুহূর্তে তিনি পরম ভালোবাসায় আমার কপালে একটা চুমু একে দিলেন। বললেন, তোমার মতো আমার ছোট এক ভাই ছিল।

কথাটি বলতেই তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো কয়েক ফোটা জল।

বানিয়াশান্তা থেকে আমার মংলায় প্রত্যাবর্তনের নৌযাত্রাটি সুখকর হয়নি।

একজন মহিয়সী পতিতার ভালোবাসায় আমার নৌ ভ্রমণটি ম্লান হয়ে গেল নিমেষেই।

বয়রা, খুলনা থেকে

নানাবাড়ি যাত্রা

- তাহমিনা খলিল

বর্ষা এলেই নানাবাড়ি বেড়াতে যেতাম। নৌকায় চড়ে বেড়াতে যাওয়া সে যে কি আনন্দ! পড়াশোনার ঝামেলা বাদ দিয়ে শুধুই বেড়ানো।

একদিন দেখতাম ছইওয়ালা নৌকা এসে ঘাটে ভিড়ছে। মাকে নেয়ার জন্য নানাবাড়ি থেকে লোক আসতো।

এক বর্ষায় নানাবাড়ি যাচ্ছি। মা ব্যাগ, সুটকেস গোছাচ্ছেন। পিঠা–পুলি বানাচ্ছেন। বাপের বাড়ি যাওয়ার আনন্দে মায়ের মন–মেজাজ খুবই ভালো। মেয়েদের চুলে তেল মেখে ফিতা বেধে দিচ্ছেন।

আমার পাত্তা নেই। আমি তখন নৌকায় বসে মাঝিদের তোলা উনুনে তাদের রান্না দেখছি। আমাকে ধরে এনে চুল বাধতে বাধতে নিত্যদিনের মতো বকাবকি চলতে থাকতো আমার উড়নচণ্ডি স্বভাবের জন্য। বাবার আদরে মায়ের বকা আমার কখনো কানে যেতো না।

সেজেগুজে নৌকায় গিয়ে উঠলাম। মা পাটভাঙা শাড়ি পরে পান মুখে দিয়ে লেবু শুকতে শুকতে নৌকায় উঠতেন। নৌকায় উঠেই একটা বালিশ নিয়ে শুয়ে পড়তেন। কারণ নৌকায় উঠলেই মায়ের বমি বমি লাগে, মাথা ঘোরে। মা শুয়ে পড়লেই ছইয়ের মুখে রঙিন চাদর বেধে দেয়া হতো।

আমরা ছইয়ের বাইরে পাটাতনে বসে বর্ষায় ভাসতে থাকা গ্রাম দেখছি। ঘাটে পানি নিতে আসা বৌঝিরা অবাক চোখে তাকিয়ে হয়তো ভাবতো, কবে তারা বাপের বাড়ি যাবে! নানাবাড়ি যাবার আনন্দে গর্বে কখনো ঠাণ্ডা পানিতে পা ঝুলিয়ে বসে আছি। ধানী জমিতে তখন বর্ষার ঠাই না পাওয়া পানি। শাপলা ফুটে হাসছে পুরো মাঠ। ছেলেমেয়েরা শালুক তোলায় ব্যস্ত। পানিতে ঝুকে ঝুকে আমরা তখন শাপলা *ঢেপ* তুলে নৌকা বোঝাই করে ফেলছি।

পর্দার ভেতর থেকে মায়ের ধমক ভেসে আসছে। ভেতরে গিয়ে বসার জন্য ডাকাডাকি করছেন।

অন্য বোনেরা মাঝে মধ্যে মায়ের ডাক শুনলেও আমি পাত্তাই দিচ্ছি না। শাপলা তোলার আনন্দ বাদ দিয়ে পর্দা ঢাকা ছইয়ের ভেতর বসে থাকা অসম্ভব। একটু দূরে বেশ বড় ফুটন্ত শাপলা তোলার উৎসাহে শরীরের অর্ধেক অংশই বাইরে ঝুকিয়ে দিলাম। শাপলাটা ধরে হেচকা টান দিতেই তাল সামলাতে না পেরে একদম টুপ করে পানিতে। পাল তোলা নৌকা এক লহমায় চলে গেল অনেক দূরে।

ঘটনার আকস্মিকতায় সাতার জানা আমিও ততোক্ষণে খাবি খেতে খেতে পানি খেতে লাগলাম। কিছুক্ষণের জন্য মনে হচ্ছিল সবাই আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছে। ভয়ে আতংকে শরীর হিম হয়ে আসতে লাগলো।

নৌকা ঘুরিয়ে মাঝিরা টেনে তুললো। মাও ভয়ে, উত্তেজনায় পর্দার ভেতর থেকে বের হয়ে এসেছেন। দুয়েকটা চড় থাপ্পড় দিয়ে আমার দস্যিপনার জন্য বকাবকি চলতে লাগলো।

সাজগোজ করা অন্য বোনদের মিটমিটিয়ে হাসির সঙ্গে ভেজা কাপড়, ভেজা চুলে কাদতে কাদতে নানাবাড়ি গিয়ে উঠলাম।

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

ধলেশ্বরী

- রেজাউল করিম

নদীর নাম ধলেশ্বরী।

সে আমার অনেক দূরের, অথচ অনেক কাছের নদী। অনেক দূরের কারণ সে বহুদিন আগে আমায় তাকে ছুতে দিয়েছিল। অনেক কাছের কারণ হলো আমি তাকে হৃদয়ের সঙ্গোপনে লালন করি। বুঝিবা আমৃত্যু করে যাবো।

না আমি কোনো গল্প লিখতে বসিনি। তেমন প্রতিভাও নেই আমার। আমি শুধু এটুকু বলবো, ধলেশ্বরী আমায় দিয়েছিল প্রথম পালতোলা নৌকায় চড়ার আনন্দ। শিশু বয়সের অপার বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে আমার আনন্দকে পূর্ণতা দিয়েছিল। তার বিস্তৃত জলরাশির ছলাৎ শব্দে যেন শত বছরের ঘুম থেকে সে আমাকে জাগিয়ে দিয়ে বলেছিল, আমাকে তোমার সঙ্গে নাও।

আমি তখন খুব ছোট। ছয় কি সাত। এতোটুকু বয়সের স্মৃতি আমায় মনে কি করে গেথে গেছে সে প্রশ্নের উত্তর আমার অজানা। মনে আছে দাদার সঙ্গে টাঙ্গাইলের কোনো এক গ্রামে বেড়াতে গিয়েছি। নাগরিক জীবনে বেড়ে ওঠা আমি সে বয়সে হয়তো শহর আর গ্রামের ফারাক ততোটা বুঝে উঠতে পারিনি। তবু নৌকায় চড়ে যখন গ্রামের স্নিগ্ধ সুনিবিড় বাতাস আমার অগোছালো চুলে বিলি দিয়ে গেল, আমি বিস্ময়ে চোখ মেলে বলি, আহ! কি সুন্দর! আশপাশের কতো শত ডিঙি নৌকা, নেংটো বা আধনেংটো দস্যি বালকদের পানিতে ঝাপাঝাপি, জল পাখিদের ওড়াউড়ি, ছইয়ের বাইরে দাড়িয়ে আমার চোখে কি যে আনন্দের পরশ বুলিয়ে যেতে থাকে!

বহুদিন পর *পথের পাঁচালী*-র অপুর চোখে সেই একই দৃষ্টি দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু সে অন্য গল্প। আগেই বলেছি, আমি কোনো গল্প বলিয়ে নই। আমার নৌ ভ্রমণ কোনো আলাদা কিছু নয়। তবে ধলেশ্বরীর বুকে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টার (সময়টা ভুল হতে পারে) সেই ভ্রমণ আমাকে প্রথম হাতছানি দেয় পথের ধারে দূরের দেশের পানে।

জীবনের বাস্তবতায় আজ আমি অনেক দূরের দেশে আছি। আমার দেশ, আমার নদীকে দূরে, বহু দূরে রেখে আজ প্রবাসে পড়ে আছি। কতো দিন ধলেশ্বরীর কাছে যাই না। হ্যা বড় হয়ে একবার তার কাছে গিয়েছিলাম। যমুনা বৃজের প্রজেক্টে আমি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করেছিলাম। তারই সূত্রে বিদেশি কনসালটেন্টের সঙ্গে যমুনা নদীকে শাসন করতে করতে ধলেশ্বরীর মোহনা পর্যন্ত আমরা দেখতে গিয়েছিলাম। শাসিত যমুনা পরম অনাগ্রহে ততোদিনে ধলেশ্বরীকে তার কোল থেকে ফেলে দিয়েছে। যে নিজেই নির্যাতিত সে ধলেশ্বরীকে কিভাবে সামাল দেবে? পানির অভাবে ধলেশ্বরী তাই শুকনো এক টুকরো সুতা যেন। আমায় দেখে সে চিনতে পারলো।

নদী তার সবটুকু অভিমান জড়ো করে আমায় বললো, তোমাকে আমি আমার বুকে করে একদিন কতো আনন্দ দিয়েছি। বিনিময়ে তুমি আমার প্রাণ কেড়ে নিচ্ছো কেন? কি আমার অপরাধ? তোমরা নগর গড়ো, সভ্যতা গড়ো। কিন্তু আমাদেরকে তার দাম দিতে হয় কেন?

শুকনো নদীর সেই দীর্ঘশ্বাস শুনে আমার তরুণ হৃদয়ে কি এক কষ্ট ভিড় করে।

আমার বিষাদ! ক্লিষ্ট মুখ বিদেশি কনসালটেন্টের দৃষ্টি এড়ায় না। তিনি আমাকে প্রশ্ন করেন, এনিথিং রং?

হেয়ালি করে বলি, এই নদীতে আমি একদিন নৌকায় চড়েছিলাম। আজ সেই নদীকেই আমরা মেরে ফেলছি। সভ্যতার কি অসভ্য আচরণ!

আমার কথা সেই কনসালটেন্ট বুঝতে পারেন না। তার জাগতিক মন দিয়ে তিনি বলে, এখান থেকে বৃজে চড়ে তোমরা নদী পার হবে। সময় কতো কম লাগবে, তাই না?

আমি সম্মত হই তাতে। নদীকে শাসন করতে আমার যেটুকু জ্ঞান আছে তা-ই নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ি বিশাল কর্মযজ্ঞের মাঝে। ধলেশ্বরীর আর্তনাদ আমার কানে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে যায়।

নিউ ইয়র্ক থেকে

নাবিকের সুখ- দুঃখ

- মোহাম্মদ নুরনবী পাটওয়ারী

আমার জাহাজের নাম *এমভি মক্কা।* এখানে প্রায় দশ বছর যাবৎ চাকরি করিছি। প্রথমে ক্রু, পরে থার্ড অফিসার হিসেবে প্রমোশন নিয়ে কর্মরত আছি। আমাদের এখানকার ভালো দিকগুলো হলো ভালো খাবার–দাবার, মুক্ত আবহাওয়া এবং নিরিবিলি ও বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে ওঠা–বসা। দেশি–বিদেশি মানুষের সঙ্গে কথা বলা। খারাপ দিকগুলো হলো আত্মীয়স্বজন, বন্ধু–বান্ধব কাউকে সঙ্গ দিতে পারি না। এক ধরনের নিঃসঙ্গতা থাকে। বিশেষ করে যারা মা–বাবাকে বেশি ভালোবাসেন। যদিও আমার বাবা নেই।

মাকে ভীষণ ভালোবাসি। মাকে দীর্ঘ সময় না দেখে থাকতে পারি না। আমার মা এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে অসুস্থ। আমার মায়ের জন্য দোয়া করবেন। যাদের মা–বাবা আছে তারা প্রাণভরে মা–বাবার সেবা করবেন। কারণ মা–বাবা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ উপহার সন্তানদের জন্য।

আমাদের আরো কষ্ট হলো মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত। এ সময় সাগর খুবই উত্তাল থাকে। ভ্রমণকারীদের জন্য পরামর্শ, এ কয়েক মাস যতোটা সম্ভব নৌ ভ্রমণ করবেন না। আর করলেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন। সাতার কাটা থেকে বিরত থাকুন। আপনারা অনেকে পানির কারেন্ট বোঝেন না। না বুঝে সাতার দিয়ে সম্প্রতি অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে।

নৌ ভ্রমণে গেলে লাইফ জ্যাকেট, বয়া পরা শিখে নেবেন। যারা নৌপথে আসা–যাওয়া করেন তাদের জন্য পরামর্শ হলো, জাহাজে উঠে আগে দেখবেন পর্যাপ্ত পরিমাণ লাইফ জ্যাকেট ও বয়া আছে কি না। এবং কিভাবে পরতে হয় তা জেনে নিন। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় তাড়াহুড়ো করবেন না। জাহাজের এক পাশ থেকে অন্য পাশে সবাই এক সঙ্গে যাবেন না। এতে জাহাজ ভারসাম্যতা হারিয়ে ফেলে। বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে বিপদকে মোকাবেলা করুন।

ভ্রমণকালীন গভীর নিদ্রা যাবেন না। ক্যাবিনের দরজা–জানালা খোলা রাখবেন। সাম্প্রতিক সময়ের দুর্ঘটনার কারণ –

এক. জাহাজগুলোর কাঠামোগত ত্রুটি।

দুই. জোয়ার ভাটার হিসাব না করে জাহাজ চালানো।

তিন. জাহাজগুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতি নেই।

চার. সার্ভে সনদপত্রের নির্ধারিত সংখ্যা এবং ওজনের বাইরে যাত্রী ও মালামাল বহন করা হয়।

যেভাবে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব -

এক. সঠিক ডিজাইন, প্ল্যান অনুযায়ী জাহাজ তৈরি করা।

দুই. আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা।

আধুনিক যে যন্ত্রপাতিগুলো থাকতে হবে –

এক. হাইড্রোলিক স্টিয়ারিং।

দুই. লিকুইড ম্যাগনেটিক কম্পাস।

তিন. রেডার।

চার. জিপিএস।

পাচ. ইকো সাউন্ডিং।

দুর্ঘটনা ঘটলে কেবল নাবিকের ওপর দোষ চাপিয়ে দেয়া হয়। যদিও নাবকিদের কিছুটা গাফিলতি থাকতে পারে। আসল কারণগুলো কেউ খতিয়ে দেখেন না। কেবল নাবিকদের বিরুদ্ধে নতুন করে আইন করা হয়। প্রচলিত আইন প্রয়োগ করাই যথেষ্ট।

যারা সরকার কর্তৃক পরিদর্শন কাজে নিয়োজিত তাদের দায়িত্ব সৎ এবং নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় জাহাজ চলাচল বন্ধ রাখতে হবে। খারাপ আবহাওয়ার কবলে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের সতর্কতামূলক তথ্য সরবরাহ করতে হবে। উল্লিখিত যন্ত্রপাতির দাম মালিকদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে। বর্তমান সময় সরকার যে ঋণ সুবিধা দিচ্ছে তা তারা সানন্দে নিতে পারেন।

পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম থেকে

ভুল

– আর.এ জামাল

নৌ ভ্রমণ অন্য সবার জন্য আনন্দের হলেও আমাদের জন্য নিরানন্দ বা ভীতিকরই বটে। বিশেষ করে আমরা যারা দ্বীপবাসী এবং যোগাযোগের একমাত্র বাহনই যাদের নৌপথ ও নৌযান।

ব্যবসায়িক কাজে প্রতি সপ্তাহে ঢাকা যেতে হয়। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব ঋতুতেই জীবনটা হাতের মুঠোয় নিয়ে নৌপথে চলাচল করি। নৌ ভ্রমণকালে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা থাকলেও অন্য রকম এক অভিজ্ঞতার কথা লিখছি।

ঢাকা থেকে মালামাল কিনে ভোলা ফিরছি। আমি তখন গুলিস্তানের কাছাকাছি। সময় সাড়ে ছয়টা। লঞ্চ ছাড়ে সাতটায়। হাতে সময় আছে আধঘণ্টা। উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে। হায়! লঞ্চ ফেল করবো বুঝি! রিকশাচালককে তাগাদা দিই। ভাই, তাড়াতাড়ি চালাও।

ঈদের বাজার, রাস্তায় প্রচুর জ্যাম। সঙ্গে মালামাল, রিকশা ছেড়ে দিয়ে হেটেও আসতে পারছি না। রিকশায় বসে ঘামছি আর মনে মনে আল্লাহকে ডাকছি যেন লঞ্চটা ধরতে পারি। এ লঞ্চ মিস করা মানে ঈদের একদিনে কেনাকাটা থেকে বঞ্চিত হওয়া। কেননা ভোলা যাবার অন্য কোনো লঞ্চ নেই।

যাই হোক। শেষ পর্যন্ত সাতটায় সদরঘাট আসি। টার্মিনালে দৌড়ে আসতেও আরো কিছু সময়।

ভোলা এবং বরিশালের লঞ্চ পাশাপাশি থাকে। লঞ্চের নাম কিংবা অন্য কিছু দেখার সুযোগ বা সময় নেই। ভোলার লঞ্চ ভেবে একটিতে উঠে পড়লাম।

তাড়াহুড়ো করে দৌড়ে প্রায় লাফ দিয়ে লঞ্চে উঠি। কলাম্বাসের আমেরিকা জয়ের চেয়েও বড় কিছু জয়ের হাসি ঠোটে এবং একই সঙ্গে দৌড়ে হয়রান হয়ে যাওয়ায় দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস বের হয়। দর দর ঘামছে সমস্ত শরীর।

লঞ্চ চলতে শুরু করেছে। দম নিয়ে দোতলার সিড়ি মাড়িয়ে উপরে উঠি। আমার লাল পৃন্টের বিছানা চাদরটির দিকে তাকাই। দেখি তিনজন লোক বসে আছে। ওই পৃন্টের চাদরই আমি ভোলার লঞ্চের হোটেল বয়-এর কাছে দিয়ে এসেছিলাম লঞ্চে জায়গা রাখার জন্য। অবশ্য বিনিময়ে কিছু টাকা দেয়ার রেওয়াজ চালু আছে হোটেল বয়কে।

আমার চাদর ভেবে ওই সিটে গিয়ে বসি। ওই তিনজনের দিকে প্রশ্নোবোধক দৃষ্টিতে তাকাই।

একই দৃষ্টিতে তারাও আমার দিকে তাকায়।

পরে এ চাদর এবং সিট আমার বলে আমি দাবি করি।

তারাও তাদের বলে দাবি করে।

এ নিয়ে দুই পক্ষের বাকবিতণ্ডা চলে কিছুক্ষণ।

কিছুক্ষণ পরে আমার খেয়াল হলো আশপাশে পরিচিত কিংবা ব্যবসায়ী কাউকে দেখছি না যে? এবার আমার ভয় হলো। আমি ভোলার লঞ্চে উঠেছি তো?

রনে ভঙ্গে দিয়ে এবার নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করি, এটা ভোলার লঞ্চ না?

আমার প্রশ্নে সিট বা চাদর নিয়ে আমাদের মধ্যে যে বাকবিতণ্ডা যারা উপভোগ করছিল তারা সবাই হেসে উঠলো।

ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলাম।

একজন জানালো, ভাই, এটা বরিশালের লঞ্চ।

নিশ্চিত হওয়ার জন্য লঞ্চের সামনে গিয়ে লঞ্চের নাম ঠিকানা দেখি। সত্যিই এটা ঢাকা-বরিশালগামী লঞ্চ। ভয়ের হিম স্রোত মেরুদণ্ড বেয়ে নামে। পকেটে দশ বারো টাকার বেশি নেই। খাওয়া-দাওয়ার টাকা, লঞ্চ ভাড়া কিভাবে দেবো? বরিশাল থেকে ভোলাই বা পৌছবো কিভাবে?

পরে লঞ্চের সুপারভাইজার বা কেরানিকে আমার এ ভুলের কথা সবিস্তারে খুলে বললে সে হোটেলে খাবার টাকা, লঞ্চ ভাড়া তো নেয়নি বরং লঞ্চ বরিশাল পৌছালে আমাকে ভোলা পৌছানোর জন্য আরো একশ টাকা হাতে গুজে দেয়।

তখন তাকে আমার কাছে ফেরেশতা বলে মনে হচ্ছিল। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষাও হারিয়ে ফেলেছিলাম যেন।

পরে অবশ্য টাকাটা পৌছে দিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল তাড়াহুড়োয় প্রথম ভুল আমিই করেছিলাম লঞ্চের নাম না দেখে। দ্বিতীয় ভুলটি করিয়েছে ওই লাল পৃন্টের চাদরটি। এ ঘটনা যখনি মনে পড়ে তখনি ওই লঞ্চের সেই দয়ালু কেরানির কালো মুখটা ভেসে ওঠে।

চরফ্যাশন, ভোলা থেকে

ভূত

– আরিফ আহমেদ

অনেক দিন আগের ঘটনা। আমার বয়স তখন দশ কি বারো। সেই বয়সেও আমি নাকি খুব গম্ভীর প্রকৃতির ছিলাম। অবশ্য এই গাম্ভীর্য এখনো ছাড়াতে পারিনি। তখনকার প্রকৃতি এখনকার মতো ঘুণে ধরা প্রকৃতি ছিল না। তখন ছিল গাছ-গাছালির ছড়াছড়ি। রাস্তাঘাট ছিল অনুন্নত। যোগাযোগ বলতে শীতকালে গ্রামের পাশের বড় রাস্তা আর বর্ষাকালে নৌকা ছাড়া তো গতিই ছিল না।

আমি ছিলাম গ্রামে বেড়ে ওঠা শান্ত ছেলে। এবং সবার আদরের। ভাইবোনদের ভেতর সবার বড় এবং শান্ত ছিলাম বলে সবাই আমাকে একটু বেশি আদর করতো। বড়-ছোট সবাই একটু সমীহও করতো।

যে বাড়িতে আমরা বড় হই এবং এখন নিজেদের বলে দাবি করি এটা হলো আমার নানাবাড়ি। আমার আব্বা ঘরজামাই হয়ে এ বাড়িতে আসেন পঞ্চাশের দশকে। আমার নানার কোনো ছেলে ছিল না। তার ছিল তিন মেয়ে। আমার মা তার বড় মেয়ে। এই মেয়ে আবার অন্যান্য দুই মেয়ের চেয়ে বেশি আদরের ছিলেন। সে জন্যই নানা এই মেয়েকে বিয়ে দিয়ে জামাইকে ঘরজামাই করে রাখেন।

তাই বলে বুঝতে পারছি না, আমার দাদা কেন তার এমন সুদর্শন ছেলেকে অন্যের বাড়িতে ঘরজামাই হিসেবে পাঠালেন। এখন দাদাকে পেলে জিজ্ঞাসা করতাম, কেন তিনি এই কাজ করলেন। কারণ আব্বা ছিলেন তার ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। আমার দাদি নাকি এই ছেলেকে চাদর দিয়ে ঢেকে রাখতেন কারো নজর লাগবে বলে।

ছোটবেলা থেকেই নানার খুব ভক্ত ছিলাম। নানা যেখানেই যেতেন, তার সঙ্গী হতাম। সেকালে গ্রাম অঞ্চলে এতো ডাক্তারের প্রচলন ছিল না। আমাদের জটিল অসুখ হলে কবিরাজই ছিল ভরসা।

আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে এক বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন। আমার নানির পেটের জটিল অসুখ ছিল যা আমার মা এখনো উত্তরাধিকার সূত্রে ধরে আছেন। এই অসুখের কারণে নানিকে প্রতি বছর কম করে দুবার সেই কবিরাজের কাছে নিয়ে যেতে হতো। তবে প্রতি বছর বর্ষাকালে একবার এটা ছিল নির্দিষ্ট। কবিরাজ বিভিন্ন গাছগাছালির রস দিয়ে দুই বোতল ওষুধ বানিয়ে দিতেন। সেই রসওষুধে তেমন কাজ না হলেও কিছুটা কাজ হতো।

সে বছর নানা-নানির সঙ্গী হলাম। আমার নানা ছিলেন খুব সাহসী। পুরনো দিনের মানুষেরা সাহসী ছিলেন। সূর্য ওঠার অনেক আগে রওনা করতে হতো এবং ফজরের আজানের আগে কবিরাজের বাড়ি পৌছানো লাগতো।

ঘটনাটা ঘটলো কবিরাজের বাড়ি থেকে ওষুধ নিয়ে ফেরার পথে। আমাদের নৌকা ছিল ছইওয়ালা। কিন্তু দুপাশই খোলা। নানি নৌকার ভেতরে নানি আর মাঝি হলেন আমার নানা। এই পথে যাতায়াত করতে হলে কবিরাজের বাড়ি পর্যন্ত কমপক্ষে পাচটি বড় কবরস্থান এবং চিতাখোলা (হিন্দুদের মৃত্যুর পর পোড়ানো হয় যেখানে) পার হতে হতো।

তখনো সূর্য ওঠেনি। একটা বাজার পার হয়ে জংলার ভেতর ছোটখাটো একটা কবরস্থান পার হয়ে কিছু দূর আসার পরই তাকে দেখলাম। খালের পাড়ে দাড়িয়ে আছে। একবার মনে হলো আমাদের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে আবার মনে হলো বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। শাদা লম্বা কাপড়, আচল মাটিতে লুটানো, লম্বায় সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। খোলা চুল, ধবধবে শাদা। মনে হচ্ছিল জমিদার বাড়ির রাজহাস মানুষের মূর্তি ধারণ করেছে।

চারদিক আলোকিত করে দাড়িয়েছিল সে। নানা-নানিকে তাড়াতাড়ি বললেন, হানিফ রে তাড়াতাড়ি চাদর দিয়া ঢাকো। দেখলে ভয় পাইবো।

তাকে লুকিয়ে দেখলাম। নৌকা বাক না ঘোরা পর্যন্ত অপলক দৃষ্টিতে তাকে দেখেছি।

সে আমাদের কিছুই করেনি। শুধু চুপচাপ দাড়িয়ে ছিল।

নানা-নানি দোয়া-দরুদ পড়ছিলেন। নানি দোয়া পড়ে আমার মাথায় ফু দিলেন।

ভয় পাইনি, একটুও ভয় পাইনি। এই প্রথম আমার অশরীরী কিছু দেখা।

সেই সময় ভয় পাইনি ঠিকই কিন্তু পরবর্তী সাত দিন আমাকে ভীষণভাবে ভুগতে হয়েছিল জ্বরে। কোনো এক বিচিত্র কারণে জ্বরে পড়েছিলাম। এই জ্বর আমাকে মৃত্যুর দরজা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। সে কি আকাশ-পাতাল জ্বর।

কেউ কেউ বলাবলি করছিল, কারণ সেই অশরীরী।

সেই আমার প্রথম এবং শেষ অশরীরী কোনো কিছু দেখা। তবে মধ্য পঞ্চাশে এসে উপলব্ধি করতে পারছি, সেই সময় ভয় না পেলেও ভয় জাতীয় কিছু আমার মধ্যে গেথে গিয়েছিল। ফলে পরবর্তীকালে বিড়ালের ডাক শুনলেও চমকে উঠতাম যা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

তাকে এখনো ভুলতে পারিনি। যখনই কোনো অন্ধকার জায়গায় যাই কিংবা ভূত জাতীয় কিছু মনে আসে তখনই সেই অসম্ভব সুন্দর মুখ আমার চোখে ভেসে ওঠে। ভয় পেতে শুরু করি।

লন্ডন থেকে
arifahmed_77@hotmail.com

অনুতপ্ত

- মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন

ভোলা থেকে লঞ্চে ঢাকা যাবো। লঞ্চের দোতলার ক্যাবিনে ঢোকার মুহূর্তেই চোখ দুটো আটকে গেল। থমকে দাড়িয়ে গেলাম। কতোক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না।

এই যে ভাই, প্লিজ, সরে দাড়ান।

এক যাত্রীর কথায় সংবিৎ ফিরে পেলাম। ক্যাবিনে ব্যাগ রেখে বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসলাম।

ক্ষণিক পরে লক্ষ্য করলাম, লঞ্চের যাত্রী ক্যাবিন বয় সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ ওই দিকেই। বারান্দায় এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ে বসে আছে। সৃষ্টিকর্তা মনে হয় নিজ হাতে সকল সৌন্দর্য দিয়ে মেয়েটিকে গড়েছেন। দুধে–আলতা গায়ের রঙের সঙ্গে গোলাপি ড্রেসটা তার সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

অন্যদের মতো আমিও প্রকৃতির সৌন্দর্যকে বাদ দিয়ে সুযোগ বুঝে অপরূপাকে দেখছি। আমার আকুলতা সে বুঝতে পেরেছিল কি না জানি না। তবে মেয়েটিও মাঝে মধ্যে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। পরিচিত হতে খুবই ইচ্ছা হচ্ছিল। ক্রমেই ভিড় বাড়তে থাকায় কোনো রকম সুযোগই পেলাম না।

সন্ধ্যার বেশ কিছুক্ষণ পর মেয়েটি চেয়ার নিয়ে ক্যাবিনের ভেতরে দরজার সামনে গিয়ে বসে।

সিঙ্গল ক্যাবিনের বেডে একুশ বাইশ বছরের একটি যুবক শুয়ে আছে। সম্ভবত ঘুমের ভান করে শুয়েছিল। রাত যতো গভীর হচ্ছিল, ক্যাবিনে বয় এবং মাস্তান টাইপের কিছু ছেলের আনাগোনা বেড়ে গেল। সতর্কভাবে তা লক্ষ্য করছিলাম।

রাত সাড়ে এগারোটা। ক্যাবিনের যাত্রীরা প্রায় সব ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল বখাটেরা বড় ধরনের একটা অঘটন ঘটাতে পারে। তাই মেয়েটিকে বললাম, অনুগ্রহ করে রুমের দরজা বন্ধ করে ভেতরে থাকুন। যে কোনো ধরনের বিপদ হতে পারে।

আমার বলার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটি দরজা বন্ধ করে দিল।

রাত প্রায় সাড়ে বারোটায় বাথরুমে যাওয়ার জন্য বের হতেই মেয়েটির রুমে ধস্তাধস্তি ও উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের শব্দ শুনতে পেলাম। তখনো রুমের দরজা বন্ধ থাকায় আমিও আর কিছু বলার সাহস পাইনি।

ফজরের নামাজ পড়ার জন্য অজু করতে বাথরুমে যাচ্ছিলাম। ক্যাবিনের দরজায় বসা মেয়েটির দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। নির্ঘুম চোখ দুটো রক্ত জবার মতো হয়ে ফুলে আছে। চুলগুলো এলোমেলো, খুবই বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল তাকে। মনে হচ্ছিল মেয়েটির ওপর শত মাইল বেগে ঝড় বয়ে গেছে।

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে অসহায় ভঙ্গিতে বললো, আপনার কথায় আমার অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেল।

হঠাৎ মেয়েটির এ ধরনের বক্তব্যে কি বলবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। শুধু বললাম, বড় ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনা থেকে বাচাতেই আপনাকে অনুরোধটুকু করেছিলাম। এতো বড় ক্ষতি হবে বুঝতে পারিনি। আমার কথার জন্য আমি খুবই দুঃখিত এবং অনুতপ্ত। আর কথা না বাড়িয়ে দ্রুত পায়ে চলে এলাম।

এখনো যখন লঞ্চে ভ্রমণ করি তখন ক্ষণিকের জন্য হলেও সেই আলুথালু বেশের অসহায় মেয়েটির মুখচ্ছবি হৃদয়ের আয়নায় ভেসে ওঠে এবং নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়। আজ সকল বাবা–মায়ের কাছে অনুরোধ থাকলো কোনো মেয়েকে ভ্রমণে এভাবে না পাঠানোর জন্য।

চরফ্যাশন, ভোলা থেকে

নদী ও নারী

- মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন আকন

নদী ও নৌপথের এক অদ্ভুত সখ্যতা। আমি বাংলার ছাত্র থাকাকালে সাহিত্য সুধা মিশিয়ে স্যারেরা বলতেন, নদী এবং নারী এক ও অভিন্ন।

তখন মনে মনে হাসতাম। বলতাম, এসব মিথ্যা কথা। আমি তখন জগন্নাথবাবুর পাঠশালা অর্থাৎ জগন্নাথ কলেজের বাংলার ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। বরিশালের মানুষ হিসেবে অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যয়ে আরামদায়ক ভ্রমণ হিসেবে লঞ্চ ভ্রমণই বুঝতাম। ঢাকা থেকে বরিশালে এসেছিলাম পুলিশের সাব–ইন্সপেক্টর পদে ভাইভা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য। পরীক্ষা দিয়ে ফেরার সময় ক্যাবিন বুক করেছিলাম *সাগর ছয়*–এর দোতলায়।

বিকেলে পরিচিত বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে সন্ধ্যায় লঞ্চে উঠলাম। আমার পাশে অন্তত গোটা পাচ ছয় ক্যাবিন ছিল প্রয়াত ডা. নাসিম বিশ্বাস এমপির নামে তিনি ও তার কর্মীদের জন্য। তার মধ্যে আমার কিছু বন্ধুরাও ছিল।

লঞ্চ বরিশাল ঘাট ছাড়লো। আমিও বন্ধুদের ক্যাবিনে গিয়ে গল্প–গুজব করে রাত এগারোটায় নিজের ক্যাবিনে এলাম।

ক্যাবিনবয় খাবার দিল। খাবার শেষ হওয়ার আগেই বললো, স্যার, টয়লেটের দরজাটা একটু জ্যাম আছে, জোরে ধাক্কা দিয়ে খুলবেন।

বললাম, ঠিক আছে।

রাত তিনটায় জাগলাম জল বিয়োগের তাড়নায়। ক্যাবিনবয়ের নির্দেশনা মতে প্রথমে দরজা ধাক্কা দিলে খুললো না। থাই এলুমিনিয়ামের দরজা। এদিকে আবার জল বিয়োগের তাড়া দিলাম সজোরে ধাক্কা। দরজা খুলে গেল। আমি তো অবাক। কিছুটা ভয় পেলাম।

মেয়েটা আমাকে বললো, দাড়ান, পালানোর চেষ্টা করলে আমি জোরে চিৎকার করবো।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। দরজা ধরেই দাড়িয়ে আছি।

ক্ষমা চাইতেই বললো, এসব ন্যাকামি ছাড়ুন। দরজা ভেঙে বাথ রুমে মেয়েদের জ্বালাতন করার যখন এতেই শখ তো...।

কিছু অশ্রাব্য ভাষণ কানে বিধলো। লঞ্চের সব প্যাসেঞ্জারই ঘুমিয়ে। আমি তো ভয়ে অস্থির যদি কেলেংকারি বেধে যায়! তার উপরে এমপি আছেন পাশের ক্যাবিনে।

দেখুন, হাতজোড় করে ক্ষমা চাইছি। আমার কথা শুনুন প্লিজ! আমাকে ভুল বুঝবেন না।

বলতেই মেয়েটি বললো, চলুন।

বললাম, কোথায়?

উত্তরে বললো, এই অপরাধ করলে মানুষ কোথায় যায় জানেন না?

পোষা বিড়ালের মতো তার সঙ্গে গেলাম। দোতলায় একদম কর্নারের একটা সিঙ্গল ক্যাবিনে।

ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললো, বসুন।

বললাম, দেখুন, আপনি অন্তত আমার কথাটা শুনুন।

সে এবার বললো, আপনি কেন বাথরুমের দরজা ভেঙে প্রবেশ করলেন?

তাকে যতোবারই ক্যাবিনবয়ের কথাটা বললাম ততোবারই বললো, নাটক করবেন না।

আমি ভয়ে কুকড়িয়ে গেছি। লঞ্চ চলছে। খানিকক্ষণ পরে বললাম, দেখুন, আপনি যদি আমাকে ক্ষমা করেন তো আমার ক্যাবিনে যাই।

এবার অন্য চাহনিতে তাকিয়ে বললো, এই প্র্যাকটিস কতোদিনের?

আমি নির্বিকার।

একটু পরে আবার প্রশ্ন, কি করেন?

বললাম, মাস্টার্সে পড়ি।

কোথায়?

জগন্নাথ কলেজে।

ওহ হ্যা আপনার বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ করতে গেলে নামটা জানা দরকার তো। আপনার নাম কি?

নাম বললাম কিছুটা বদলিয়ে। এবার একটু সাহস নিয়ে বললাম, আপনার নামটাও আমার জানা দরকার।

সাবলীল ভঙ্গিতে উত্তর, ফারহানা।

কোথায় থাকেন?

রোকেয়া হলের বর্ধিতাংশে।

বুঝলাম ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া। মনে মনে ভাবলাম হলের মেয়েরা এমন সাহসীই হয়। বললো, বরিশালে বাসা কোথায়?

খানিকটা মিথ্যার আশ্রয় নিলাম। দেখলাম পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণযোগ্য। আস্তে আস্তে তার কথোপকথনে ভয় কাটলো। বললাম, আমি যাই।

এবার সে বললো, আচ্ছা, বাথরুমে আপনি আমাকে যেভাবে দেখেছেন তা না হয়ে যদি অন্যভাবে দেখতেন?

বললাম, দেখুন, এটা নিছক একটা দুর্ঘটনা মাত্র।

কিছু বলতে না বলতেই ক্যাবিনের লাইট অফ করে দিল এবং খানিকক্ষণ পরেই তার তৃষ্ণার্ত ঠোটের উপস্থিতি টের পেলাম। আস্তে আস্তে নদীতে ঢেউ না থাকলেও তার গতিময়তা বাড়তে থাকলো।

সমান তালে পাল্লা দিলাম। আমার দুষ্ট হাত স্বাধীনতার সুযোগ পেয়ে তার যুগল মাংসপিণ্ডকে দলিত-মথিত করলেও সে সতর্ক সাবধান। সালোয়ারের বাধন খুলতে দিল না। এভাবে চললো অনেকক্ষণ। আমার তো সবশেষ। আমি শান্ত নদীর মতো শান্ত হলাম।

ফারহানা লাইট জ্বালিয়ে দিয়ে বললো, কখনো আর এমন অপরাধ করবেন না।

আমার ঠিকানা চাইতে ঠিকানা দিলাম, তার ঠিকানাও নিলাম। কিন্তু কোনোদিন তাকে খুজতে যাইনি তার ঠিকানা।

বিআরডিবি, গলাচিপা থেকে

মেঘনার ডুবোচরে

- মোহাম্মদ সামছুজ্জামান ভূইয়া

১৯৮৭ সালের ঘটনা। আমি তখন চাদপুরে চাকরি করি। চাকরির বয়স মাত্র দুই বছর। বিয়ে করিনি। তাই বাড়ির প্রতি টান স্বাভাবিকভাবেই একটু বেশি। জুলাই মাসের মাঝামাঝি বাড়ির জন্য মন কেমন কেমন করে উঠলো। মরা মন নিয়ে পনেরো দিন কাটিয়ে আগস্ট মাসের ১ তারিখে বেতন পেয়েই বাড়ি যাবার জন্য ছুটি নিলাম। সেদিন বিকেলে মা-বাবা, ভাই-বোনদের জন্য বিভিন্ন ধরনের উপহার সামগ্রী কিনে নতুন একটা সুটকেসে ঢুকিয়ে বাড়ি চলে এলাম।

প্রথমে মাকে, পরে বাবাকে এবং শেষে ভাইবোনদের উপহার সামগ্রী বিতরণ করলাম। তারা সবাই আমার উপহার পেয়ে অত্যন্ত খুশি হলো। বাড়িতে আমার আগমন উপলক্ষে মা ভালো ভালো খাবার রান্না করলেন এবং বিভিন্ন ধরনের পিঠা তৈরি করলেন। মা-বাবার স্নেহে ও ভাইবোনদের ভালোবাসায় সাতটি দিন চোখের নিমেষে কেটে গেল। পরদিন সকালেই চাদপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবো। সুটকেস গুছিয়ে রাখলাম। সকালে

ঘুম থেকে জেগে দেখি রাতে সিধ কেটে আমার সুটকেসসহ ঘর থেকে অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গেছে চোরে। আমরা রাতে তা টেরই পাইনি।

দুই দিন বাড়ি থেকে থানা, পুলিশ করলাম, কোনো লাভ হয়নি। চোর আমার জুতোও চুরি করেছে। তৃতীয় দিন বাবার কাছ থেকে ভাড়ার টাকা নিয়ে শূন্য হাতে এক জোড়া রাবারের স্লিপার পরে বাড়ি হতে বের হলাম। আমার ভ্রমণটা হরিষে বিষাদ হয়ে গেল।

বিকেলে ঢাকায় পৌছে সদরঘাট এলাম। রাতের লঞ্চের টিকিট কাটলাম। ক্যাবিন না পেয়ে বসলাম ডেকে। রাত নয়টায় লঞ্চ সদরঘাট টার্মিনাল ছাড়লো।

ফুরফুরে হাওয়ায় প্লাস্টিকের চেয়ারে বসেই মাথা ঝুলিয়ে ঘুমিয়ে গেলাম। কতোক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ঝাকুনি খাওয়ায় ঘুম ভেঙে গেল। ওই ঝাকুনিতে চেয়ার থেকে ডেকে পড়ে গেছি। ক্যাবিনের বাইরের যাত্রীদের সবারই একই অবস্থা। লঞ্চ থেমে গেছে এবং একদিকে কাত হয়ে আছে। প্রথমে ভাবলাম কোনো ঘাটে থেমেছে। কিন্তু যাত্রীদের মাঝে গুঞ্জন ও উৎকণ্ঠা দেখে আমিও অনুসন্ধিৎসু হলাম।

ঘন কুয়াশায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দুই একজন যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে কিছুই বলতে পারলেন না। লঞ্চ কাত হয়ে থাকায় ডেকে হাটতে বেশ সমস্যা হচ্ছিল। মনে হঠাৎ প্রশ্ন জাগলো লঞ্চ কি কোনো ডুবো চরে ধাক্কা খেয়ে আস্তে আস্তে কাত হয়ে ডুবে যাচ্ছে? আশংকার কথাটা একজনের কাছে ব্যক্ত করতেই সেই ভদ্রলোক কোটর থেকে দুই চোখ রেরে করে তারস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, *লঞ্চ ডুইব্বা যাইতাছে! আমি তো সাতার জানি না। আমার কি হইবো গো! আমারে একটা লাইফবয় দেও কেউ! সুকানিকে আগেই কইছিলাম একটা বয়া দিতে!*

ভদ্রলোকের চিৎকারে পুরো লঞ্চে আতংক ছড়িয়ে পড়লো। আতংক ও ভয়ে যাত্রীরা এলোমেলোভাবে এদিক–সেদিক ছুটাছুটি শুরু করলো।

আমি বয়া নেয়ার জন্য সেদিকে গেলাম। কিন্তু বয়াগুলো শোপিসের মতো নাইলনের দড়ি দিয়ে এমনভাবে বেধে রাখা হয়েছে যে আমি শত চেষ্টা করেও দড়ির গিট খুলতে পারলাম না। বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম অন্য কোনো যাত্রী বয়া নিতে এদিকে এগিয়ে এলো না। যাত্রীদের বয়া ব্যবহারের অভ্যাস না থাকার কারণেই এমনটি হয়েছে।

আমি পুকুরে সাতার শিখেছি এবং ভরা বর্ষায় থই থই মাঠে সাতার কেটেছি। কিন্তু এই সাতার মেঘনা নদীতে কাজে লাগবে কি না বুঝতে পারছি না। ভয়ে বুক দুরু দুরু করছে। কোনদিকে যাবো, কি করবো বুঝতে পারছি না। আতংকিত যাত্রীদের মধ্যে থেকে দুই একজন ভয়ে পানিতে লাফিয়ে পড়েছে কি না বুঝতে পারছি না। সঙ্গে কেউ না থাকায় আলাপও করতে পারছি না। লঞ্চ ভর্তি যাত্রীদের মাঝেও আতংকিত আমি একা।

এদিকে লঞ্চের সারেং বা সুকানিদের পক্ষ থেকেও কোনো রকম আশার বাণী শোনানো হচ্ছে না। মনে হচ্ছে লঞ্চে তারা কেউ নেই। এখন মনে হচ্ছে তাদের নীরবতা পালন করা ঠিক হয়নি। এক সময় বুঝতে পারলাম লঞ্চ আর কাত হচ্ছে না। লঞ্চকে ডুবতে হলে আরো কাত হতে হবে এবং কাত হতেই থাকবে। কিন্তু তা তো হচ্ছে না! তার মানে লঞ্চ ডুবছে না! এ কথাটা মনে হতেই আমার মন থেকে নিমেষেই ভয় দূর হয়ে গেল।

সাহসী হয়ে লঞ্চের মাঝখানে গিয়ে যাত্রীদের উদ্দেশ্য বললাম, যাত্রী ভাইবোনেরা, ভয়ের কিছু নেই। আমাদের লঞ্চ ডুবছে না!

আমার এই কথা শুনে যাত্রীদের গুঞ্জন থেমে গেল।

কণ্ঠ উচিয়ে ফের বললাম, ভয়ের কিছু নেই। লঞ্চ ডুববে না। লঞ্চ কাত হয়ে আছে শুধু। ডোবার হলে এতোক্ষণে ডুবে যেতো। আপনারা আতংকিত হয়ে ছোটাছুটি করবেন না। এলোমেলোভাবে ছোটাছুটি করলে

লঞ্চ ডুবে যেতে পারে। আপনারা যে যেখানে আছেন, চুপচাপ বসে থাকেন। মনে হয় লঞ্চটি কোনো ডুবোচরে আটকে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের নড়াচড়া থেমে গেল। যাত্রীদের মাঝে কোনো গুঞ্জন নেই।

ফের বললাম, লঞ্চের সুকানিরা কোথায়? তাদের দেখছি না কেন? তারা কি লঞ্চ থেকে হাওয়া হয়ে গেল?

এই সময় একজন সুকানি এগিয়ে এসে বললো, *আপনি ঠিক কথাই বলছেন ভাই। লঞ্চ একটি চরে আটকা পইরা গেছে। ঘন কুয়াশায় কিছুই দেখা যাইতাছে না। সারা রাইত এখানেই আইটকা থাকতে হইবো। সকালে কুয়াশাও থাকবো না, জোয়ারের পানিও আসবো। তখন লঞ্চ আপনিতেই চর থেইকা ছুইট্টা যাইবো। যাত্রীদের ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। আপনারা আরাম কইরা ঘুমান।*

সুকানির কথা স্বস্তিদায়ক হলেও তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা এতোক্ষণ কোথায় ছিলেন? লঞ্চ চরে আটকে গেছে এটা আমি বুঝতে পেরে যাত্রীদের না বললে এতোক্ষণে ভয়ে তারা লাফিয়ে পানিতে পড়তে শুরু করতো। ইতিমধ্যে দুই একজন লাফ দিয়েছে কি না আল্লাহই জানে! একটা কথা, বয়াগুলো এমনভাবে বেধে রাখছেন যেন সেগুলো প্রদর্শনীযোগ্য জিনিস, ব্যবহারযোগ্য নয়। আপনারা কসাইয়ের মতো হয়ে গেছেন! শুধু যাত্রীদের চামড়া ছিলে লাভ করতে জানেন। যত্তো সব!

সুকানি আমার কথার কোনো জবাব দিল না বা প্রতিবাদ করলো না। আরেকটা আশ্চর্যের বিষয় হলো, আমি এতোগুলো কথা বলে লঞ্চ কর্তৃপক্ষের ভুল ধরিয়ে দিলাম। তবুও যাত্রীদের মধ্য থেকে আমার সঙ্গী হলো না। উল্টো লঞ্চ ডুবছে না জেনে যাত্রীদের ডেকের ওপর ফের বিছানা বিছিয়ে ঘুমের আয়োজন করতে দেখা গেল। আমি মুচকি হেসে এদিক–ওদিক মাথা নেড়ে আমার আসনের দিকে এগিয়ে গেলাম। এসে দেখি আমার আসন দখল হয়ে গেছে। ডেক বা ডেকের চেয়ারে আসনের কোনো টিকেট না থাকায় দখলদারকে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলাম। সেখান থেকে সরে ক্যাবিনের ইস্পাতের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে ঝিমুতে লাগলাম। সারা রাত তন্দ্রাভাবেই কেটে গেল।

ভোরে কুয়াশা নেই, জোয়ার এসেছে। লঞ্চ চর থেকে ছুটে সোজা হয়ে ফের চলতে শুরু করলো। চাদপুরে নেমে গেলাম। চাদপুরে আরো কিছু যাত্রী নামলেন এবং সমান সংখ্যক যাত্রী উঠলেন। বরিশালের যাত্রীদের একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। একদিন বিলম্ব হলেও কুয়াশাচছন্ন রাতে ডুবে যাওয়ার ঝুকি নিয়ে যাওয়ার চেয়ে দিনের আলোয় নিশ্চিন্তে যেতে পারছেন।

মন্তব্য : লঞ্চযাত্রীদের প্রত্যেকের অবশ্যই লাইফ জ্যাকেট বা লাইফ বয় নিয়ে লঞ্চে ওঠা উচিত। এতে সামান্য বোঝা বৃদ্ধি পেলেও অমূল্য জীবন রক্ষা পাবে।

জয়পুরহাট থেকে

বশির

কলিম উদ্দীন রাজ

বীরগাও হাই স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ার সময় কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেলাম। পরস্পরকে খুবই ভালোবাসতাম আমরা। কোনো কারণে আমাদের কেউ স্কুলে না এলে সবাই তার খোজ নিতাম।

আমাদের মধ্যে বশির ছিল অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র। সে দেখতে যেমন সুন্দর ছিল তেমনি তার কণ্ঠও ছিল সুমধুর। তাই তো আমাদের স্কাউটের কোরআন তেলাওয়াত, হামদ, নাত সবই তার দায়িত্বে ছিল। স্কাউট টিচার হক আমাদের চেয়ে একটু বেশিই ভালোবাসতেন বশিরকে।

এসএসসি পরীক্ষার শেষ দিন বশির বায়না ধরলো সবাই এক সঙ্গে ছবি তুলবো। এবং প্রত্যেকের কাছে একটা করে কপি থাকবে স্মৃতি স্বরূপ।

শত ব্যস্ততার মাঝেও একে অপরের খোজখবর রাখবো বলে সবাই একমত হলাম।

পরীক্ষার রেজাল্ট বের হলো যথাসময়ে। আমরা সবাই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভ করলাম। আমরা সবাই শহরের কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য গ্রাম ছাড়লাম শুধু বশির ছাড়া। কারণ বশির সংসারের বড় ছেলে হওয়ায় সংসারের গুরুভার তার ওপর। তাই সে শহরে না গিয়ে ভৈরব হাজী আসমত কলেজে ভর্তি হলো।

বিশেষ কারণে এইচএসসি পরীক্ষার আগেই আমাকে কর্মময় জীবন শুরু করতে হলো। ইতিমধ্যে সকল বন্ধুরা ডিগ্রি পাস করে ফেলেছে। আমাদের মাঝে তেমন যোগাযোগও নেই।

কোনো এক বিকেলে কর্মস্থল ফার্মাসিতে বসে আছি। কতোগুলো লোক দ্রুত হেটে যাচ্ছে দেখে একজনের পথ রোধ করে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা সবাই কোথায় যাচ্ছেন?

তিনি বললেন, লালপুর চকের কাছে একটা লঞ্চ ডুবে গেছে এবং অনেক লোক মারা গেছে।

বললাম, ফিরে এসে আমাকে বিস্তারিত খবর দেবেন।

রাত পেরিয়ে ভোর হতেই পাশের বাড়ি থেকে কান্নার রোল শুনতে পেলাম। কান্নার কারণ হলো, পাশের পাচ ছয়জন আমারই আত্মীয় ওই লঞ্চে ছিল। কান্নার আওয়াজ তীব্র থেকে তীব্রতর হলো। মানুষের হাহাকারে পুরো এলাকাতে শোকের ছায়া নেমে আসে।

কে যেন হঠাৎ আমায় বললো, তোমার বন্ধু বশির, ও তো ওই লঞ্চে ছিল।

এ কথা শোনা মাত্রই ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেলাম। কতোক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম জানা নেই। তবে অনুভব করতে লাগলাম হাতুড়ি দিয়ে কে যেন আমার বুকের পাজরগুলো গুড়ো করছে।

সবাই লাশ দেখার জন্য গেলেও আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

পরের দিন এক বন্ধু এসে বললো, বশিরের আম্মা নাকি বশিরকে বলেছিলেন, বাবা, আজ ভৈরব যাবার দরকার নেই। আকাশের অবস্থা ভালো না।

বশির তার মাকে বলেছিল, মা আমার জন্য কোনো চিন্তা করো না। এক লঞ্চে যাবো আর অন্য লঞ্চে ফিরে আসবো।

কিন্তু বশির তার মায়ের বুকে কখনো ফিরে আসেনি এবং আসবেও না। কেননা চিরতরে সে নদীর বুকে হারিয়ে গেছে। শুধু রেখে গেছে হাজারও স্মৃতি। এসএসসি পরীক্ষার সময়ের তোলা ছবিটি এখনো আমাকে কাদায়। ওই লঞ্চের দুই তিনজন ভাগ্যবান যাত্রী ছাড়া বাকি দুইশ যাত্রীকে মেঘনায় অকালে প্রাণ দিতে হয়েছে। শুধু বিশ ত্রিশ যাত্রীর লাশ পাওয়া গিয়েছিল। অনেক দিন পর্যন্ত স্বজন হারানোর বেদনা বুকে নিয়েও স্বজনের লাশ পাবার আশায় অনেকেই মাথায় হাত দিয়ে নদীর কূলে বসে থাকতো।

পূর্ণ ঠিকানা বিহীন, সউদি আরব থেকে

কিস

- জেসমিন আক্তার উষা

আমাদের বাসায় ভাইয়া প্রায় আসা-যাওয়া করতো। এতো সুন্দর করে কথা বলতে পারে ছেলেরা তা ভাইয়াকে না দেখলে বুঝতেই পারতাম না। ভাইয়ার কথা এবং চেহারা যে কোনো মেয়েকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে। ভাইয়ার ছদ্ম নাম ব্যবহার করলাম ধ্রুব।

ক্লাস এইটে কি নাইনে পড়ার সময় থেকে ধ্রুবভাইয়াকে ভালোবাসতাম। ভাইয়ার সঙ্গে কতো কথাই না বলতাম কিন্তু *তোমাকে ভালোবাসি* এই দুটি শব্দ বলতে আমার সময় লেগেছিল প্রায় দেড় বছর। আমার অনেক কাঙ্ক্ষিত ফসল এই প্রেম, এই ভাইয়া। তাই সাধারণত ধ্রুবকে কোনো বিষয়ে না করতাম না।

একদিন বিকাল পৌনে পাচটায় রওনা দিলাম প্রাইভেট পড়তে যাওয়ার জন্য। রিকশা মুসলিম গার্লস ইন্সটিটিউট–এর কাছে আসতেই ধ্রুব আমার রিকশা থামিয়ে ভাড়া দিয়ে রিকশাচালককে বিদায় করে দিল।

ধ্রুব আমাকে বললো পার্কে যাওয়ার জন্য।

আমি এতে সায় দিলাম।

আমরা পার্কের দক্ষিণ কোণে একটি ছোট কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে বসে আলাপ করছিলাম। নতুন প্রেম ও উচ্ছ্বাসে ভর্তি, আবেগে ভরপুর। বেশ ভালোই লাগছিল।

হঠাৎ ধ্রুব বললো নৌকায় চড়ার জন্য।

ভীষণ ভয় হচ্ছিল নৌকায় চড়তে। কারণ তখন ছিল বর্ষাকাল। মেঘের কোনো ঠিক–ঠিকানা নেই। এর উপর আবার নদীতে প্রচণ্ড স্রোত। তারপরও ধ্রুবকে না বললাম না।

ব্রহ্মপুত্র নদীর তীর ঘেষেই ময়মনসিংহ পার্ক অবস্থিত। মাঝিকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঘণ্টাপ্রতি কতো? মাঝি যা উত্তর দিল তা শুনে আমাদের মাথায় বাজ ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা। সাড়ে তিনশ টাকা।

যাহোক, দরকষাকষি করে ঠিক করা হলো ঘন্টাপ্রতি পয়তাল্লিশ টাকা।

নৌকায় উঠে আমরা কি কথা বলেছিলাম তা হয়তো বা আমার স্মৃতির পাতা থেকে মুছে গেছে। তবে ধ্রুব একটি গান গেয়েছিল। এটা মনে আছে। গানটি হচ্ছে, ও.... ওরে নীল দরিয়া, দে....রে আমায় ছাড়িয়া....।

আমরা নৌকায় বাদাম চিবুচ্ছিলাম এবং আমাদের কথাবার্তা শুনে মাঝির মনেও হয়তো রঙিন বাতাস বয়ে যাচ্ছিল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে প্রচণ্ড বাতাস বইতে শুরু করলো। বাতাস বিপরীত দিক ছিল বলে মাঝি নৌকার পাল নামাতে বাধ্য হলো।

বৃষ্টি শুরু হলো। আমরা খুবই চিন্তিত ছিলাম। কি হবে না হবে, বাচবো কি বাচবো না ইত্যাদি।

নিঃশব্দতা ভেঙে ধ্রুবকে বললাম, আমরা যদি মরে যাই।

তার সোজাসাপ্টা উত্তর, তাহলে ভালোই হতো। আমাদের কারোরই দুঃখ থাকলো না।

আমরা এই সময় দুজন দুজনার হাত ধরে বসেছিলাম।

যাহোক, কোনো অঘটন ঘটলো না। কিছু পরে ঝড় থেমে গেল। তখনো আমাদের নৌকা পাড়ে এসে পৌছায়নি।

ধ্রুব নৌকার মধ্যে আমাকে কিস দেয়ার দুঃসাহসিক ইচ্ছা প্রকাশ করলো।

বললাম এই অবস্থায়, মাঝির সামনে!

এ বুড়ো আমাদের কিছুই করতে পারবে না কিছু উপদেশ দেয়া ছাড়া।

তারপরও আমি পারবো না।

তোমার পারা লাগবে না, তুমি শুধু সম্মতি দেবে।

চুপ করে রইলাম।

ধ্রুব ছিল একগুয়ে। যা বলবে তাই করবে। কিছুটা হিটলারের মতো।

ধ্রুব বললো, আমি আজকের বিকেলটাকে স্মরণীয় করে রাখতে চাই। তুমি বাধা দিও না। এই বলে এক রকম জোর করেই আমাকে কিস দিল।

ওই দিন আমি আর তার সঙ্গে আলাপ করিনি। নৌকা পাড়ে আসতেই আমি সোজা বাসায় চলে এলাম। বাসায় এসেই শুনতে হলো প্রচণ্ড বকাবকি। কারণ প্রাইভেট থেকে দেরি করে বাসায় ফেরা এবং ভেজা শরীরে।

আজ ওই সময় থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। আজও আমাদের প্রেম বিদ্যমান। সে এখন ঢাকায় থাকে, আমি ময়মনসিংহে। মাঝে মধ্যে আমাদের দেখা হয়, আলাপ হয়। বেড়াতে যাওয়া, হয়তো বা কোনো সময় নৌকা ভ্রমণও করা হয়। কিন্তু আমরা প্রথম নৌকা ভ্রমণের কথা ভুলিনি। ভুলিনি প্রথম কিস-এর কথা।

ময়মনসিংহ থেকে

হ্যাটট্রিক

- এসএম রাজু আহমেদ

যখন ক্লাস ফোরে পড়ি তখন আমরা সমবয়সী বন্ধুরা মিলে সুযোগ পেলে নৌকা নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম।

একদিন আমরা কয়েকজন দুইটি নৌকা নিয়ে অনেক দূর ঘুরতে গেলাম। হঠাৎ করে বৃষ্টি এলো। এমন বৃষ্টি এলো, আমরা সকলে ভয় পেয়ে গেলাম। কারণ নৌকার কোনো ছাউনি ছিল না। নৌকাতে বৃষ্টির পানি সেচ করার মতো কোনো পাত্র ছিল না। তাই আমরা চিন্তায় পড়ে গেলাম।

আমাদের মনে যে ভয় ছিল সেটাই হলো। হঠাৎ করে নৌকা দুটো ডুবে গেল। ভয় হচ্ছে, নৌকা কিভাবে পানি থেকে ওঠাবো! হঠাৎ একটি বাড়ির পাশে এসে নৌকা রাখলাম। আমরা সকলে মিলে একটি পাত্র সংগ্রহ করলাম। দুইটি নৌকাতে আটজন ছিলাম বলে নৌকা পানি থেকে তুলতে সমস্যা হলো না। পরে সেচ করে নৌকা তুলে বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

তারপরও আমরা এই ঘটনার পর সময় পেলেই নৌকা নিয়ে ঘুরতে যেতাম। নৌকা ভ্রমণ বড়ই আনন্দদায়ক।

এরপর আরেকটি ঘটনা হলো। ডিঙি নৌকায় আমাদের পরিবার থেকে সবাই গেলাম এক খালাতো ভাইয়ের বিয়েতে। সালটা ১৯৯০। সেখানে তখন ছিল বর্ষাকাল। যেখানে বিয়েতে গেলাম নৌকা ছাড়া বর্ষাকালে চলাচলের কোনো পথ নেই।

তাই বিয়ের পরের দিন আমি, আমার এক দুলাভাই, খালাতো ভাই, আমার এক বোন, সঙ্গে আরেক চাচাতো বোন ছিল। তারা বললেন, চলো নৌকা দিয়ে ঘুরে আসি। তাই আমরা সবাই মিলে ডিঙি নৌকা নিয়ে অনেক দূর চলে গেলাম।

তখন ছিল বর্ষাকাল। পানির স্রোত ছিল প্রচণ্ড। নৌকাটি আমি চালাচ্ছিলাম।

হঠাৎ তারা একটি স্কুল দেখে বললেন, এখানে থামাও। নেমে ঘুরে আসি।

তাই তাদের কথা মতো এক সাইডে থামালাম। ডিঙি নৌকার একটা দোষ, এক সাইড হলে নৌকা ডুবে যাবে। ফলে হঠাৎ তারা নামার সময় আমি ছিলাম নৌকার মাথায়। নামছেন আমার চাচাতো বোন। নামতে গিয়ে নৌকা ডুবে গেল।

আমি ছিলাম নৌকাতে। তাই পানিতে পড়ে গেলাম। এমনভাবে পড়লাম মনে হলো, সাতার না জানা কোনো লোক ডুবে গেল। মাথাটা নিচের দিকে, পা দুটো উপর দিকে।

আমার এই দৃশ্য দেখে তারা সবাই হাসাহাসি করলেন। এবং বিয়ে বাড়িতে সবাইকে ঘটনাটা বললেন।

তারা হাসছিলেন এই ঘটনা শুনে।

আমি একটু লজ্জা পেলাম।

তারপর কয়েক বছর আমার কোনো চাচাতো বোন ওই নৌকা ডোবার দৃশ্যের কথা, আমার পানিতে ডুবে যাবার ঘটনা মনে করে হাসতো।

আমিও মাঝে মধ্যে হাসতাম। এখনো হাসছি। কারণ দৃশ্যটা খুবই হাস্যকর।

এভাবে কয়েক বছর কেটে গেল। যখন মনে চাইতো, বন্ধুরা মিলে অনেক ঘুরতে যেতাম।

এরপর ১৯৯৬ সালের ঘটনা। আমি কোরিয়াতে আসার পাচ ছয় মাস আগে জানুয়ারি মাসে। আমার বড় দুলাভাই, বড় ভাই-ভাবী, ভাতিজা, দুই বোন, আমরা গেলাম সিলেটে ঘুরতে। উদ্দেশ্য মাজারে খাওয়া। তারপর মাজারে কাজ শেষ করে ঘুরতে যাবো।

এর পরদিন গেলাম জাফলং পাথরের দৃশ্য দেখার জন্য এবং ঝোলানো বৃজটা দেখবো। তাই সবাই গেলাম।

ঝুলানো বৃজ দেখতে হলে ডিঙি নৌকা দিয়ে ওপার যেতে হবে। তাই নৌকা ভাড়া করলাম। নৌকাতে আমরা সবাই উঠলাম। বাকি ছিল আমার এক বোন। তিনি যখন নৌকার সাইডে এক পা রাখলেন নৌকা ডুবে গেল।

আমরা সবাই ভিজে গেলাম। তারপর আর কি করবো। কোনো রকম ওপার গিয়ে ভেজা শরীর নিয়ে দৃশ্যগুলো উপভোগ করলাম।

সাউথ কোরিয়া থেকে